'আমার ভূত-দেখা'!

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

বিচিত্রিত

প্রকাশক

শ্রীরাধারমণ দাস

ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস্

৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

আষাঢ়, ১৩৪৮

দাম আট-আনা ১

প্রিণ্টার—

শ্রীরাধারমণ দাস

ফাইন আর্ট প্রেস,

৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

'যুগল-সাহিত্যিক'

পরমকল্যাণীয়

শ্রীমান্ ক্ষিতীন্দ্রলাল রায় ও

শ্রীমান্ রবীন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য

পরস্পরেষু!

এই বইয়ের বড়ো বড়ো যতো মজার গল্প

আর শ্রীশৈলর শ্রীহস্তের আঁকা অজস্র হাসির কার্টুন্ !
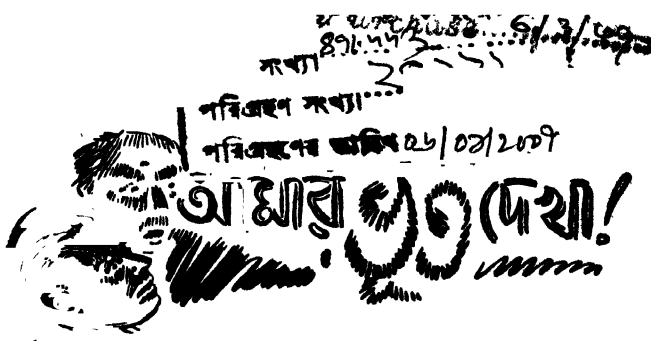
গোড়াতেই বলে রাখি এটা হাসির গল্প নয়। কেননা, ভূত দেখা, আর যাই হোক্, হাস্যকর ব্যাপার নয় নিশ্চয়ই?

এবং এও বলা দরকার যে এটা গল্পও না। আন্‌কোরা সত্য ঘটনা। ভূত দেখার মতো সত্য ঘটনা, সত্যিকারের দুর্ঘটনা জীবনে আর কী আছে? যাঁরাই ভূত দেখেছেন, আমাদের মধ্যে অনেকের স্বচক্ষেই হয়তো এই দুর্যোগ ঘটে থাক্‌বে, তাঁরা সবাই এক বাক্যে আমার কথার সাক্ষ্য দেবেন।

ভূতের গল্প মানেই সত্যিকারের গল্প!

অবশ্যি, এও বল্‌তে চাই, এই জীবনে অদ্ভুত আমি অনেক কিছুই দেখেছি, এবং এখনও দেখ্‌তে হচ্ছে। কষ্ট করেই দেখতে হচ্ছে। কিন্তু ভূত আমি সেই একটিই—বা একসঙ্গে সেই দুটিই—যা একবার দেখেছিলাম—দেখে ফেলেছিলাম! দৈবক্রমেই।

বিনি আর আমি বাড়ীর খোঁজে বেরিয়েছি, পুরণো বাসায় মন টিক্‌ছে না। নতুন একটা আবাস্ দেখে উঠে যাব এই

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী

বাসনা। এক জায়গাতে কতদিন আর মাথা গোঁজা যায়? খাঁচার পোষা জানোয়ারদেরই পোষায় কেবল। চোর ছ্যাঁচোররা হ্যাওটা না হলেও, চাম্‌চিকেরা এসে আড্ডা না গাড়লেও, কাঁকড়া-বিছেরা যখন তখন যেখানে সেখানে দেখা না দিলেও, আরসোলারা ফুর্ ফর্ আর ধেড়ে ইঁদুররা ধর্ ধর্ করে' ঘরময় না ঘুরলেও (কে আর তাদের ধর্‌ছে?), পাড়াটেরা আড়াল থেকে না ঢিলোলেও, তেমন কিছু অনিষ্ট না ঘট্‌লেও, এক জায়গায় ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে থাকাটা—এম্‌নিতেই কেমন খারাপ লাগে নাকি? ভাড়াটে বাড়ী আঁক্‌ড়ে, মাটি কাম্‌ড়ে-পড়ে-থাকা একটু বাড়াবাড়ি দেখায় না? পৈতৃক ভিটে কিছু নয়, পরকে টাকা গুণে পরের বাড়ীতে তৎপর হয়ে থাক্‌ব—অতটা পরার্থপরতা কি ভালো?

সেদিন সকালে বিনি, বিনা কারণেই, কলকাতায় আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। এবং উঠেই বল্ল, প্রথম কথাই বল্ল সে:

"এই আস্তাবলটা এবার ছাড়ো তো বাপু!"

"হ্যাঁ, এই আস্তানাটা এইবার বদ্‌লানো দরকার! বহুদিন তো কাটল!" আমিও ওর হ্রেষাধ্বনিতে যোগ দিয়েছি। তার একটু আগে আমিও অকারণেই কালির দোয়াতটা বিছানায় উল্টে ছিলাম, কাজেই আমার সহানুভূতির অভাব ছিল না।

এবং তারপরেই আমরা তীরবেগে রাস্তায় নেমে বাড়ী খুঁজ্‌তে বেরিয়ে পড়েছি।

কিন্তু মনের মত বাসা আর পাই কই? 'টু-লেট্' দেখলেই এগিয়ে যাই, খানিকক্ষণ লট্‌কে থাকি, তারপর আরো একটু বেশি দেখে ছিট্‌কে বেরিয়ে আস্‌তে হয়।

'টু-লেট্' তো চার ধারেই ছড়ানো, অনেক বাড়ীতে ভাড়াটে এসে জুট্‌লেও ছাড়ানো হয়নি। নতুন বাসিন্দেরাই নড়াতে ছায়নি, ভাড়া করার দ্বিতীয় দিনেই, কড়ার করে' বাড়ী ছাড়ার নোটিশ দিয়ে রেখেছে। কড়া নোটিশ!

পয়সা খসিয়ে, ইঁট কাঠ বসিয়ে এসব কী বানিয়ে রেখেছে এরা? জমির ওপর এসব কী জমিয়ে রেখেচে? দেখে দেখে বিরক্তি ধরে গেল? এদের—এই সব অট্টালিকাদের—ধরাশায়ী করবার জন্যেই অনতিবিলম্বে, বড় গোছের ভূমিকম্প কিম্বা এয়ার্-রেড্—যা হোক্ একটা কিছু হওয়া দরকার।

অবশেষে বেহালার দিকে একটা ভালো বাড়ীর খোঁজ পেলুম। আমরা যেমনটি চাই ঠিক তেমনটিই নাকি বাড়ীটা। অল্প কখানি ঘর নিয়ে, ছোট্ট-খাট্টর মধ্যে, অথচ ভাড়াও বেশি নয়; এমন কি তার একতালার ঘরগুলোও তালাক্ দেবার মতো না! তালা দিয়ে না রেখে ব্যবহার করবার মতোই। সাম্‌নে একটু লনের মতোও রয়েছে নাকি!

খবর পেয়েই ছুট্ দিলুম। রিনি আর আমি।

খবরটা উড়ে এলেও, একেবারে উড়ো খবর না। অনির্ব্বচনীয় না হলেও পছন্দসই সত্যই। আশপাশ থেকে, এ-কোণ ও-কোণ

আমার ভূত-দেখা

—নানান্ কোণ থেকে, নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে, উপাদেয় বলেই বোধ হোলো বাড়ীটাকে। বার থেকে তো ভালোই, এবার ভেতরে পা বাড়িয়ে দেখা যাক্!

বাড়ীওলার ছেলে, এসে সদরের তালা খুলে দিলে। তালার ওপরে ধূলো জমে রয়েছে। মাথার চৌকাঠে মাকড়সার জাল জড়ানো। দেয়ালে দেয়ালে চটা-উঠে-যাওয়া। সারাবাড়ীর আষ্টেপৃষ্ঠে কী একটা সাবেক কালের ছোপ্—কেমন একটা প্রত্নতত্ত্বের ছাপ্ মারা যেন!

"পোড়ো বাড়ী নয় তো দাদা?" বিনি খুঁৎ খুঁৎ করে।

"না না! কী বল্ছেন?" ছেলেটি প্রতিবাদ জানায়: "চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু পোড়েনি। তাহলে তো আমরা ইন্সিওরেন্সের টাকাগুলো পেতাম। বেশ মোটা টাকাই!"

"য়্যাঁ, কী বল্লে?" আমি বিচলিত হই।

"দমকলওলারা এসে পড়্ল কিনা!" ছেলেটি অভিযোগ করে।

হ্যাঁ, কি রকম একটা আধপোড়া ধরা ধরা গন্ধ বাড়ীটার গা থেকে বেরিয়ে আমাদের নাকে এসে ধাক্কা লাগায়! পুরণো, ফিকে, কি জাতীয় একটা বিজাতীয় গন্ধ কেমন!

"কদ্দিন ভাড়া হয় নি, য়্যাঁ?" আমি জিগ্যেস্ করি: "আগের ভাড়াটেরা উঠে গেছে কদ্দিন?"

"তা বেশ—বেশ অল্প কিছুদিন।" ছেলেটি থেমে থেমে বলে।

'দরজার মাথায় মাকড়সার জালিয়াতি দেখছি যে ?
দে হ্যাভ্ ফোর্জ্জড্ অ্যাহেড !'

(পৃষ্ঠা—৬)

"অল্প কিছুদিন? বলো কি? দরজায় মাকড়সার ওড়্না জড়ানো দেখছি যে?"

"কী বল্ছেন?" ছেলেটি চোখ বড় বড় করে' তাকায়।

"মাথার ওপর মাকড়সার জালিয়াতি দেখছি কিনা।" আমি সহজ করে' বলি এবার। এবং সঙ্গে সঙ্গে, ইংরেজিতে পরিষ্কার করে' মানে করে' দিই: "দে হ্যাভ্ ফোর্জ্জ্ড্ য়্যাহেড্!"

যাক্—ভেতরে তো পা বাড়াই।

ছেলেটি কিন্তু কিছুতেই সঙ্গে আসে না। বলে: "আমার ইস্কুলের টাইম্ হয়ে যাচ্ছে।"

"কতো আর দেরি হবে? ঘরগুলো একবার ঘুরে ফিরে দেখা বইতো না!" আমি ওকে সাদরে অভ্যর্থনা করি: "এসো এসো! চলে এসো!"

"আমি বাইরেই আছি। বেশ আছি।" ছেলেটি আমাদের প্রেরণা ছ্যায়: "আপনারা যান্ না, ভয় কি? এইখানেই তো রয়েছি।"

দরজা খুলে, মাকড়সার জালনা ভেদ করে' ভেতরে তো ঢুক্লাম। ঢুকে দেখলাম, যে লোকটা খবর দিয়েছিল নেহাৎ মিথ্যে বলেনি। পাকা সিমেণ্ট-করা, নীচের ঘরগুলো পর্য্যন্ত চমৎকার! সামনের লনে দিব্যি ব্যাড্মিন্টন্ চলবে। ধুলোবালি ঝেড়েঝুড়ে, ধোলাই করে' নিতে পারলে—তোফাই হবে। বাড়ীখানি বেশ। ভাড়াও বেশী নয়। কলকাতার বুকে—

ঠিক বুকে না হলেও উপকণ্ঠে তো বটেই—এ যে একেবারে রাজযোটক !

সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় ওঠা গেল।

এবং উঠেই যা দেখলাম—সে এক দৃশ্য !

সামনের ঘর থেকে দুটি যুবক—হৃষ্টপুষ্ট দুটি যুবক—যদিও সে-সময়ে তারা যে খুব হৃষ্ট ছিল হলপ্ করে' একথা বলা চলে না—হুড়মুড় করে' বেরিয়ে এল—হুটোপাটি করতে করতেই বেরিয়ে এল। দুজনের মধ্যে সে কি হাঁচোর-পাঁচোর, ধ্বস্তাধ্বস্তি আর আছ্ড়া-পাছ্ড়ি ! পরস্পরের ধাক্কা সামলাতেই দুজনে বারান্দায় গিয়ে পড়েছে—একেবারে কাঠের রেলিংটার কাছ ঘেঁষে বারান্দার ধারটায়।

এ ওকে কিলোচ্ছে, সে তাকে কিলোচ্ছে। যে যাকে পাচ্ছে বেকসুর কিলিয়ে নিচ্ছে।

দুজনের মধ্যে সে কী তুমুল সংগ্রাম !

অতখানি বীরত্বের চোট সামান্য কাঠের রেলিং সইতে পারে কেন ?

সেই মুহূর্ত্তেই কাঠের গণ্ডী ভেঙে দুজনেই—দুজনাই তারা—দারুণ তাল ঠুক্তে ঠুক্তে—কোথায় আর ? কোনো গতিবে কাঠের রেলিংয়ের মায়া একবার কাটাতে পারলে কোথায় আর যাওয়া যায় ? সোজা নীচের দিকে, অধঃপতনের পথে, সিমেন্ট দিয়ে শানানো একতলার উদ্দেশেই সটান্ রওনা হয়ে গেছে

ততক্ষণে তাদের চিহ্নমাত্র নেই—অন্ততঃ বারান্দার ওপরে তো নেই। তাদের তখনকার চোখ মুখের সেই ভীতিবিহ্বল ছবি এ-জীবনে আমি ভুলতে পারব না।

এত কাণ্ড ঘটে গেল আমাদের সামনেই—আমার আর বিনির চোখের ওপরেই।

এবং একেবারে নিঃশব্দেই ঘটে গেল।

বলা বাহুল্য, ওরকম একটা দৃশ্যের পর ওবাড়ীতে আর ওঠা চলে না। ভূতে ভূত কিলোচ্ছে, এরকম দেখতে পাওয়া সচরাচর দুর্ল্লভ, খুবই বিরল তাতে ভুল নেই, কারণ, শোনা যায় এবং দেখাও গেছে—(নিজের কানে এবং অন্যান্যের চোখেই)—যে, ওরাই অপরদের, যারা ভূত নয় তাদের ধরে' পাক্‌ড়ে মজা করে' পিটিয়ে নেয়। খবরের কাগজেও মাঝে মাঝে পড়া যায় না যে তা নয়!

তবু, দর্শনীয় হিসাবে যতই কেন উপভোগ্য আর অভূতপূর্ব্ব হোক্ না, সেই দুর্ম্মূল্য বিলাসিতা করতে গিয়ে কে ওদের কিলাতিশয্যের মধ্যে গিয়ে পড়বে বাপু? তাছাড়া, বিনি আমাকে বুঝিয়ে দিল, এমনও তো হতে পারে, ওরা ষড়যন্ত্র করে', সন্ধিসূত্রে এসে, অবশেষে ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে কিম্বা বেওয়া-রিশ বিবেচনায়, আমাদের দুজনকে শতকরা পঞ্চাশের-আধাআধি বখ্‌রায় নিজেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা করে' নিতে পারে। ভাগাভাগি করে' বিনে পয়সায় মারামারি করবার মৎলবেই আর কি!

এবং আমিও বিনিকে বুঝিয়ে দিলাম, সেরকমটা হলে 'মারামারি' আর হবে না ; কেননা, ভূতকে মারা, আর যার দ্বারাই হোক, আমায় দিয়ে অন্ততঃ হবার নয়। নিজের ক্ষতির ভয়ে নয়, ভূতের প্রতি মমতায় নয়, এবং কেবল যে আমার ক্ষমতার অতিরিক্ত তা বলেও না, আমার দুঃসাহসের একটা সীমা আছে তো! অতএব, ওটা কেবল একতরফা, ভূতের জবানি, এক-চেটে 'মারি' হবে বলেই ধরে' নেয়া যেতে পারে। এবং স্বচক্ষে যা দেখা গেল, যে রকম এক রোখা চলতে থাকবে, তাতে মহামারি তো বটেই!

অতএব বাড়ী বদলানো আর হোলো না! সেই দুর্ঘটনার পর, অপর কোনো অচেনা আড়তে ওঠা আমাদের সাহসে কুলোলো না। কোথায় গিয়ে ফের কিম্বিধ ভূতের দর্শন পাবো কে জানে! যেখানে আছি সেই ভালো! পুরাণো কোটরেই পুনর্মূষিক হয়ে পড়ে থাকলাম। এই সাবেক আড্ডাটার সুবিধা এই, (যেটা নতুন করেই সম্প্রতি আমাদের চোখে পড়ল), এখানে আশেপাশে যে দুএকজন অবাঞ্ছনীয় রয়েছেন, তাঁরা নিতান্তই জলজ্যান্ত এবং জানাশোনার মধ্যে ; এখন পর্য্যন্ত এতদিনেও একটিও মৃত ভূতের সাক্ষাৎ আমরা পাইনি। এবং বিনির বিবেচনায় (আর আমারও ঐ মত) মৃত ভূতেরাই বেশি রকম ভয়াবহ।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে, ইতিমধ্যে বিনি একদিন সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়েছে এবং এক রাত্তিরে আমি—আমি নিজেও

—খাট থেকে পিছ্‌লে গেছি, আর ছোট খাট হোঁচোট তো লেগেই রয়েছে, চলতে ফিরতে ঠোকাঠুকরও বড় কম খাচ্ছি না, এ-ছাড়া অম্লমধুর আছাড়ের তো কথাই নেই! তবু, অখাদ্যের এত বাড়াবাড়িতেও, বাড়ী বদলানোর নাম কেউ মুখেও আনিনি। এত সব সত্ত্বেও, চমৎকার শান্তির মধ্যে কালাতিপাত করা যাচ্ছিল। এমন সময়ে একটি ভদ্রলোক একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

"আমি, আমি শ্রী লালায়িত রায়। একজন লেখক।" বল্লেন তিনি: "হাসির গল্প লিখি।"

"ও! তা—তা—" আমি আম্‌তা আম্‌তা করি: "আপনিও একজন হাস্যকর লেখক? বেশ বেশ!"

লোকটিকে, লেখকটিকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হয়।

"আমি আসছি বেহালা থেকে। 'আবছায়া' নামক পাক্ষিক পত্রিকার পক্ষ থেকে। আবছায়ার নাম শুনেছেন নিশ্চয়?"

"আবছায়া? শোনা শোনা বলেই মনে হচ্ছে তো! তা, কী দরকার বলুন্?"

"আজ্ঞে, আবছায়া সম্পাদক তুষানল ভট্ট—যিনি একাধিক বৈজ্ঞানিক বই লিখেছেন—"

"হ্যাঁ, জানি। ভট্ট মশায়ের নাম শুনেছি। শুনেছি বলেই সন্দেহ হচ্ছে যেন!" আমি সন্দিগ্ধ ভাবে ঘাড় নাড়ি।

"কেন, একটা লেখাও কি পড়েননি তাঁর? আমাদের

'আজ্ঞে, আমিই সেই লালায়িত রায়—হাসির গল্প লিখি—

(পৃষ্ঠা—১০)

নৃপেনবাবুর লেখার অনুকরণে তিনি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখবার চেষ্টা করছেন, সে কি আজ কম দিন হোলো ? এখনও তেমন নাম করতে পারেননি; ভারী দুঃখের কথা।"

"কেন, নাম করতে পারেননি কেন ?" আমার কৌতূহল হয়।

"হয়েছে কি, নৃপেনবাবুর সাহেবের ওপর তিনি টেক্কা মারতে যান, কিন্তু পেরে ওঠেন না। মেরে কেটে বড় জোর একটা তিরি মেরে বসেন। ভারী বিচ্ছিরি! সেইজন্যেই তো নাম হয় না, উল্‌টে বদ্‌নাম হয়ে যায়।"

"হবে হবে, নাম হবে! ক্রমশই হবে। এমন বহুৎ প্রতিভা আছে, বেঁচে থাক্‌তে যাদের নাম বেরয় না। তারপরে মারা যাবার পর—"

"হ্যাঁ, মরে পচে ভূত হয়ে গেলে—" লালায়িত রায় বাধা দিয়ে বলেন: "তখন তো বেরুবেই। নাম আর গন্ধ দুই একসঙ্গে বেরুবে তখন। কিন্তু তখন নিয়ে কে মাথা ঘামাচ্ছে মশাই ? এখন যা অবস্থা দেখ্‌চি খুবই শোচনীয়। আপনি— আপনিও তাঁর লেখা পড়েননি, শুনে অতি মর্ম্মাহত হলাম।"

"না না, পড়েচি বইকি! তাঁর তথাকথিত বৈজ্ঞানিকতা এক আধটা নিশ্চয়ই পড়ে থাক্‌বো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মনে পড়চে, পড়েচি। খুব অখাদ্য লেখেন না তো ভদ্রলোক ?"

"আজ্ঞে না, ভালই লেখেন। আমার চেয়ে ভাল না, তবু খুব মন্দ নয়। তাঁর কাছ থেকেই আসছি, এবং আমার নিজের

কাছ থেকেও বটে। আমরা দুজনেই আবছায়ার—কি বলে গিয়ে —কামধেনু—এক কথায় সৃষ্টিকর্ত্তা এবং রক্ষাকর্ত্তা—একমাত্র আর অদ্বিতীয়।"

"তা তৃতীয় ব্যক্তির কাছে কি কারণে আসা? আমি কি করতে পারি বলুন্?" এবং আনুষঙ্গিক জানিয়ে দিই: "সম্পাদকতা আমি করতে পারিনে।"

"না না না, সেজন্যে নয়। এবং লেখার জন্যেও না। আমরা আপনার কাছে লেখা টেখা চাইনে, ভয় নেই, ছোট্ট একটু কাগজ, নিজেদের লেখা ছেপেই কুলিয়ে উঠতে পারিনে, তার ওপরে আমাদের পিস্‌শ্বশুর মাস্‌শ্বশুর মামাশ্বশুর এবং কম্পোজিটাররা রয়েছেন। কম্পোজিটাররাও আমাদের কাগজে হাত পাকায়। পাকিয়ে নেয় মশাই, বাধা দেয়া যায় না,—বেতন পায়না কি না! লেখার জন্যে নয়, তবে—তবে কিনা—" বলতে বলতে উনি হঠাৎ থেমে যান।

কিছুটা তখন আমি আশ্বস্ত হয়েছি: "তাহলে আর ভয় কি? লিখতে না হলে আর ভয় কি? বলুন্! বলে' যান্!" ওঁকেও তখন ভরসা দিয়ে দিই।

"আজ্ঞে, আমরা আপনাকে একটা টী পার্টি দিতে চাই। খুব ছোট্ট একটু টী পার্টি। তার নিমন্ত্রণ করতেই আমি এসেছিলুম। আপনার সুবিধামত একদিন, যেদিন আপনি বলবেন, আমাদের ওখানে গিয়ে, দয়া করে' যদি যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ—"

জলযোগের আহ্বানে কে না কাবার হয়? আমিও একটু কাৎ হলুম।

"তা, আর কে কে থাকবেন, সেই পার্টিতে?" আমি জিজ্ঞেস করি: "নামকরা লেখকদের আর কেউ?"

"তাঁদের অনেককেই আমাদের করা হয়ে গেছে। তাঁদের খতম্ করেই আপনার কাছে এসেছি। এদিন কেবল আপনি আর আমরা। আমরা মানে সম্পাদক তুষানলবাবু আর আমি। আমি হচ্ছি আমাদের আবছায়ার সহকারী সম্পাদক এবং—এবং সহকারী সম্পাদক থেকে ষ্ট্রীট্ হকার্ পর্য্যন্ত সব! যাবতীয়! গুপ্ত কথাটা আপনাকে বলতে আর দোষ কি? আপনি তো আমাদেরই একজন!"

"তা বেশ। আমরাও জন দুই যাব। আমি আর বিনি। ওঃ, বিনি? বিনি আমার ছোট বোন।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে, যথাসময়ের কিছু আগেই, বিনি আর আমি বেহালায় গিয়ে পৌছলাম। অনেক যুঝে ঠিকানাও খুঁজে বার করা গেল।

য়্যা, এযে সেই বাড়ী! সেই মারাত্মক বাড়াবাড়ি যার রেলিং ভেদ করে' একদা নীচে নেমে গেছল সেই প্রাণ-নিয়ে-টানাটানি বাড়ীই যে!...কী সর্ব্বনাশ!...

দরজার মাথায় 'আবছায়া কার্য্যালয়'—সাইন্‌বোর্ড্ লট্‌কানো, এবং তার পাশেই সিনেমার লম্বা চৌড়া বিজ্ঞাপন মেরে গেছে :

দেবদত্ত ফিল্‌মের পথ ভুলে ! —তৎসহ— সাবধান ! !

একে বিনি সারা রাস্তা পাশাপাশি, 'তুমি ভুল কোরো না পথিক !'—গুণ্ গুণ্ করতে করতে এসেছে, তার ওপরে ভূত-পূর্ব্ব সেই বাড়ী আর তার গায় লেপ্‌টানো এই বিজ্ঞাপন—সাবধানাত্মক এই বাণী—দেখেই আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে' উঠল। আমি আর আমার মধ্যে নেই !

আগুপিছু করতে করতে কখন কড়া নেড়ে বসেছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এসেছেন।

"এই যে ! আপনারা ! আপনারাই ! আপনাদেরই অপেক্ষা করছি,"—অমায়িকভাবে করমর্দ্দনে তিনি এগিয়ে এলেন : "আমি তুষানলবাবু। আমার সেই মাস্‌তুত ভাইটি—আমাদের সহকারী সম্পাদক—তিনি একটু বেরিয়েছেন। এই এসে পড়লেন বলে' ! আসুন্ আপনারা।"

এই বলে' আমাদের হস্তগত করে' তিনি ভেতরে নিয়ে গেলেন।

তুষানলবাবুকেও কোথায় যেন দেখেছি, চেনা চেনা বলেই সন্দেহ হোলো। কোনো সাহিত্যিকের আসরে বা সাহিত্য-বাসরেই দেখে থাকব হয়ত। আজকাল প্রত্যেক অলি-গলিতেই তো লেখকের বৈঠক বেধে রয়েছে। সাহিত্যের আখ্‌ড়ার তো অভাব নেই! প্রায় সকলেই কাগজের ওপর কুস্তি করছে।

দোতালায়, সেই কাঠের রেলিং-ঘেরা বারান্দার কোণ ঘেঁষে, একটা তেপায়া টেবিল ঘিরে আমরা তিনজনে বসলুম। সেই কাঠের রেলিংটা তেমনি অক্ষত দেহে রয়েছে; এখনো ছিন্নভিন্ন হয়নি। একান্ত অকারণেই, তখনো, আমাদের বুক মাঝে মাঝে ছম্ ছম্ করে উঠলেও, নিতান্ত অমূলক ভয়েই, এমন চমৎকার বাড়ীটা আমরা হাতছাড়া করেছি তা বুঝতে বাকী ছিল না। কেননা, এই তুষানলবাবুরাই বা এমন কি মন্দ আরামে এখানে বসবাস করছেন? তাঁরা যে সদাসর্ব্বদা কিম্বা কালেভদ্রেও কখনো এস্থলে কোনো বিভীষিকা দেখেছেন বা দেখে আসছেন—তাঁদের চেহারায়, কই, তার চিহ্নমাত্রও তো নেই!

কাঠের রেলিংটা আমাদের দিকে তাকিয়ে কাষ্ঠহাসি হাসতে থাকে!

ভেবে দেখলে, ভূত জিনিসটা কী? অতীতের আবছায়া ছাড়া আর তো কিছু নয়? বিগতকালে যে সব ঘটনা বা দুর্ঘটনা

তুষানলবাবু খিকি খিকি এগিয়ে আসেন !

(পৃষ্ঠা—১৫)

ঘটে গেছে আকাশপটে তার পুনর্মুদ্রন বই তো নয়? পৃথিবীর যত কিছু শব্দের মতো যাবতীয় দৃশ্যও তো আবহাওয়ার ভাঁড়ার ঘরে জমা হয়ে যাচ্ছে, ক্রমাগতই জমছে। আমাদের কান যদি কখনো রেডিয়োর পর্য্যায়ে ওঠে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও ওঠে, তাহলে সেই মুহূর্ত্তেই আমরা আকাশবার্ত্তা শুনতে পাই, দৈববাণী যার নাম দিয়েছি। তেমনি এই নশ্বর নেত্র যদি কখনো টেলিভিসনের পর্দ্দায় নামে, তাহলে তার আকস্মিক আভাসেই দৈবাৎ দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে যায়—যাকে বলি ভূত! কিন্তু বার-বারই যে সেই একই দৃশ্য দেখব, বারম্বারই এই চর্ম্মচক্ষু টেলিভিসনে পরিণত হবে তার কি মানে আছে? হায় হায়, অন্ধতাবশে, ভুলক্রমে এমন যার-পর-নাই খাসা বাড়ীটা বেহাত হতে দেয়া বড্ড বোকামি হয়ে গেছে ভেবে মনের মধ্যে হাহুতাশ হতে থাকে।

একটু পরেই লালায়িত রায়, অকৃত্রিম-সম্পাদকের-সহযোগী সেই আদিম লেখক, একরাশ খাবারের মোট নিয়ে ফিরে এলেন। খাবারের সম্পাদনা করতেই তিনি বেরিয়েছিলেন, বোঝা গেল। কিন্তু তাঁকে দেখে আর তাঁর হাতে খাবারের ঝুড়ি লক্ষ্য করে' কোথায় আমরা পুলকে উল্লসিত হয়ে উঠব, তা না, ততক্ষণে আমাদের হয়ে এসেছে!

প্রথম দর্শন থেকেই ওঁদের দু'জনকে আমাদের চিনি চিনি ঠেকছিল। কিন্তু কেন যে অত মিঠে মনে হচ্ছিল, এখন ওঁদের

উভয়কে একসঙ্গে দেখে, একেবারে পাশাপাশি দেখে, যুগপৎ দেখবার পরে বুঝ্‌তে আর বাকী থাকল না।

এঁরা উভয় যে সেই তুটি ভয়—ভয়াবহ সেই তুই অভিব্যক্তি—একদা যাঁদের আমরা এইখানেই, এই বারান্দার ধারেই, ধাক্কাধাক্কি করে' রেলিং ভেঙে সবেগে নেমে যেতে দেখেছি—সেকেলে সেই-তুই অবতারই আজ এই-তুই নব-রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেবিষয়ে আর সংশয় মাত্র রইল না।

সেদিন এঁদের—এই মারাত্মক মাস্‌তুত ভাইদের—অশরীরী দেহে দেখেছিলাম, ওঁদের কার্য্যকলাপও ছিল নিঃশব্দ। কিন্তু আজ—আজ একটু আগেও তো ওঁদের একজন করমর্দ্দনের অজুহাতে নিজের অস্থিমজ্জার অস্তিত্ব আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন এবং এতক্ষণ ধরে' কতো খোস্ গল্পই তো একত্র বসে' করা গেল—এসব কি একান্তই মহাপ্রভুদের ছলনা তাহলে?

এঁরা কি তাহলে—তাই ছাড়া আর কিছু না? ভাবতে না ভাবতেই আমাদের হৃৎকম্প সুরু হয়ে যায়!

কিন্তু একটু একটু করে' আমাদের ভয় ভাঙে। তুজনের—তুই মাস্‌তুত ভাইয়ের—গলায় গলায় ভাব দেখেই সন্দেহ দূর হয়। ওঁদের চালচলন অত্যন্তই স্বাভাবিক—সাধারণ মানুষের যেমন হয়ে থাকে। কোথাও কোনো ব্যত্যয়—কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নেই—এবং রেলিং চূর্ণ করার মারাত্মক কোনো

মৎলব যে ওঁরা মনে মনে ভাঁজ্‌ছেন, ওঁদের আচার-ব্যবহার থেকে ঘুণাক্ষরেও তা বোঝবার যো নেই।

তবে বোধ হয় এখনও ওঁরা সম্পূর্ণরূপে ভূতান্তরিত হতে পারেন নি। আগের নশ্বর শরীরেই, কষ্টেসৃষ্টে, রয়ে গেছেন তাহলে!

আর তাছাড়া, ভেবে দেখতে গেলে (ভেবে আমাদের স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে), একজন ভূতের পক্ষে (না হয় দুজনাই হোলো) পক্ষের পর পক্ষ, একখানা পত্রিকা বার করা এবং তার সমস্ত কপি লেখা, লেখা যোগাড় করা, তার ওপরে প্রুফ্‌ দেখা, তারপর সেই সব কচায়ন প্রেস থেকে ছাপিয়ে আনা, (ভাবতেই গায়ে জ্বর আসে), তারপরে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ষ্টলে ষ্টলে গিয়ে যত না কপি জমা দিয়ে আসা, এবং সব শেষে সহরের সব হকারদের কাছ থেকে মারামারি আর কাড়াকাড়ি করে' তার দাম আদায় করা চাট্টিখানি কথা নয়! একজন ভূতের পক্ষে এত ভূতের খাটুনি খাটা কি সম্ভব? দুজনের পক্ষেও কঠিন। রীতিমতই কঠিন! সত্যিকারের ভূত হলে কবে এই ভৌতিক জগৎ ছেড়ে পিট্‌টান্‌ দিত!

কিন্তু তবুও সেই অতীতের কথা মনে হলে একটু যেন কেমন কেমন লাগে, একটু আশ্চর্য্যই লাগে কেমন! ভূত যদি না হয়, তাহলে সেদিন তবে কি আমরা ভবিষ্যৎ দেখেছিলাম?

নিছক্‌ ভবিষ্যৎ-ই? ভূত নয় তাহলে?

খাবার আসার সঙ্গে সঙ্গেই ওঁরা দুজনেই পাশের ঘরে ঢুকেছিলেন। জলযোগের গোছগাছ করতেই বোধ হয়।

বিনি আর আমি, মুখোমুখি তাকিয়ে থাকি, এক কথাই ভাবি দুজনে। কী যে ভাবি তা আমরা নিজেরাই জানিনে।

একটু পরেই একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসে: "এই এই! তুই খাচ্ছিস্ যে বড়ো?"

"বাঃ, আমি কষ্ট করে' আন্‌লাম! আমি খাব না?"

"তা বলে' এখন খাবি? এখনই খাবি? অতিথিরা বসে' নেই? তাদের আগে দেয়া হোক্।"

"ভারী আমার অতিথি! বস্তিবাটির আস্তিখুড়ো আমার! যতই খাওয়াও চাঁদ, ও-সব ভবী ভুলবার নয়! অনেক তো খাইয়েছ, অনেককেই তো খাইয়েছ। খাইয়ে ফল হয়েছে? বিনে পয়সায় লেখা পেয়েছ একটাও? সে-বিষয়ে খুব হুঁসিয়ার, সে পাত্রই নয় ওরা।"

"শুন্‌তে পাবে, চুপ্!"

"শুন্‌লো তো বয়েই গেল! আমি থাক্‌তে আব ছায়ায় আর কারুকে লিখতে দিচ্ছি নে। কোনো মিঞাকে না! টাকা দিয়েও না—টাকা নিয়েও নয়। কেবল আমি লিখ্‌ব। আর তুমি, তুমি সম্পাদক, তুমিও লিখ্‌তে পারো। আর কেউ না।"

"আব্‌দার্ আর কি! জানিস্ আমার কাগজ? তোকে লিখ্‌তে দিয়েছি তাই বর্ত্তে গেছিস। [illegible] কেন্তু

ছাপে নাকি? লেখা ছাপানোর জন্যে চার ধারে তো কেঁদে কেঁদে বেড়াস্!"

"আমার লেখার তুমি কি বুঝবে? জান্‌ত তোমার দাদা। লেখার জন্য রোজ ধর্ণা দিত আমার বাড়ী। ক'জোড়া জুতোই ক্ষইয়ে ফেলেছিল! হুঁঃ!"

"দাদা তুলো না বল্‌ছি। ভালো হবে না কিন্তু।"

"তোমার চেয়ে ভালো লিখি কিনা, সেই জন্যেই তোমার রাগ। বুঝেছি। কিন্তু তার জন্যে আর কী করবে? কে আর তোমার মুখ চেয়ে খারাপ লিখতে যাচ্ছে? কাল্‌কের ছেলেও তোমার চেয়ে ভালো লিখে তোমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে—তোমার চেয়ে নামজাদা হয়ে যাচ্ছে। তা বাপু তুষানল, নিজের অনলে এমন তিলে তিলে কত আর দগ্ধ হবে? তার চেয়ে—এমন ধিকি-ধিকি না জ্বলে নিজেকে ধিক্কার দাও—গলায় দড়ি দাও—সব ল্যাঠা চুকে যাক্! সেই তোমার ভালো।"

"দ্যাখ্, ভালো হচ্ছে না কিন্তু! এইসা এক থাপ্পড় কসাবো, টের্ পাবি তখন! সব লম্ফ ঝম্ফ বেরিয়ে যাবে এক্ষুনি। তোর লেখা ছাপানোও বেরিয়ে যাবে। আর তোর লেখা ছাপ্‌ব না, যাঃ!"

"তোমার লেখাই বা কে ছাপ্‌চে? আর কোন্ কাগজ ছাপ্‌চে শুনি? নিজের বই তো নিজের টাকায় ছাপো, আবার কথা কইতে আসো! নিজের দোকানে নিজে তো

দাঁড়িয়ে ব্যাচো! কখানা তার বিক্রি হয়? পরের হিংসেয় জ্বলে মরছ কেবল! সম্পাদক বলে' কিছু বল্‌ছি না, নইলে—"

তর্জ্জনের তোড়জোড় বেড়েই চলে! বিনি ভীতিবিহ্বল নেত্রে তাকায়।

হঠাৎ ধাঁ করে' একটা রসগোল্লা কক্ষচ্যুত হয়ে ছিট্‌কে আসে, উল্‌কার মতই ছুটে আসে, কিন্তু একটুর জন্যে ফস্‌কে যায় আমার গালে এসে লাগে,—ওদের গোলমাল শুনে আমি হাঁ করে' ছিলাম, কিন্তু কোনো ফল হয় না। মুখের মধ্যে না ঢুকে রসগোল্লাটা, গালের গায়ে লেগে, আমাকে বাঁয়ে রেখে, নিজের আবেগে ছিট্‌কে বেরিয়ে যায়।

গতিক ভালো নয়। অন্ততঃ, রসগোল্লাদের গতি বিধি খুব সুবিধের নয়!

কিন্তু তাছাড়াও—আরেকটা খট্‌কা লাগে। চট্‌ করে' আমার মনে হয়, অতীতকালের সেই ভবিষ্যৎ—সুদূরপরাহত সেই সম্ভাবনা, অত্যন্ত বর্ত্তমানে, এখনই, নিতান্ত আসন্ন হয়ে আস্‌ছে না তো? ঘোরালো হয়ে, আরো জোরালো হয়ে এবং ক্ষীণকায় রেলিংয়ের ওপর যদ্দূর সম্ভব ভারালো হয়ে? য়্যাঁ?

সেই একদা যাদের ভূত বা ভবিষ্যৎ যাই হোক্‌ আমরা দর্শন করেছি, কিন্তু এখন পর্য্যন্তও যারা ভূত হতে পারেনি তাদের কি অকৃত্রিম আসল ভূতে পরিণত হতে বেশি আর দেরি নেই? অচিরেই কি সেই নিদর্শন দেখ্‌ব?

কাঠের রেলিংটা অটুট রয়েছে, এখনো রয়েছে, কিন্তু কতক্ষণ আর এমন থাকবে ? ভাবতেই আমরা শিউরে উঠি।

আইন্‌ষ্টাইন্ নাকি বলেছিলেন, যা অতীত, তাই ভবিষ্যৎ, এবং তারাই আবার বর্ত্তমান ; এক কথায় ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সব একাকার। মোটের ওপর এই গোছের কী একটা কথা বহুবিধ প্রমাণের সাহায্যে আমাদের কাছে তিনি গছাতে চেয়েছিলেন। বলাবাহুল্য আমার বোধগম্য হয়নি। কিন্তু আজ এই মুহূর্ত্তে, জাজ্বল্যমান্ দৃষ্টান্তের সাম্‌নে—আগতপ্রায় ওই দুই উদাহরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিমেষের মধ্যে সেই তত্ত্ব, দুরধিগম্য সেই তথ্য, বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো আমার মাথার মধ্যে খেলে যায়।

সমস্ত কাল, ইহকাল ও পরকাল, কালাতীত সব রহস্য, এই কালান্তক আসন্নতার কাছাকাছি আস্‌তেই পলকের মধ্যে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙে পড়ে—চিচিং ফাঁকের মত বেবাক্ পরিষ্কার হয়ে যায়।

বুঝতে পারি, ইতিহাস যেমন ঘুরে ফিরে আসে, যে-কারণে আসে, তেম্‌নি, সেই কারণেই, অনন্তের অজ্ঞাত-ভাণ্ডারে-জমানো একই সব দৃশ্য, অভিন্ন সব কথা, অনুরূপ সব ভাব, যুগে যুগে, খোলস বদ্‌লে যাতায়াত করে। খবরের কাগজের নিউজ্ কলমের মতো, নতুন হুজুগের রূপ নিয়ে, সেই-সব একঘেয়ে পুরণো খবর পুনরাবৃত্ত হয়। ঘুরে ফিরে ফের এসে

রসগোল্লাদের গতিবিধি খুব সুবিধের নয়!

(পৃষ্ঠা—২৩)

দেখা স্বায়—আবার আমরা নতুন করে' পড়ি। পড়তে বাধ্য হই।

হারানো অতীত, বাড়ানো বর্ত্তমানে এসে, হারিয়ে গিয়ে, আবার অনাগত ভবিষ্যতে উদ্‌যাপিত হতে থাকে। সেই উদ্‌যাপনের দায় নিয়ে পুনঃ পুনঃ আমরা জীবন যাপন করি—কিন্তু কার জীবন যাপন করি? আকাশের সংবাদপত্র আগাগোড়া যার পড়া, নখদর্পণে যার, এমন কেউ যদি কোথাও থাকে, সেই কেবল তা বল্‌তে পারে।

এই সব ভাবি আর কাঠের রেলিংটা আমাদের দিকে চেয়ে কটাক্ষ করে!

আর কিছুনা, ভূত-ভবিষ্যৎ মাথায় থাক্, কেবল বর্ত্তমানের হাত থেকে—আত্মরক্ষা করবার জন্যে, খুনোখুনির সাক্ষী হবার দায় থেকে ঘাড় বাঁচাবার জন্যেই, আমি আর বিনি, পরস্পরকে করায়ত্ত করে' সেই যে সেখান থেকে ছুট্ মেরেছি—

বেহালার পথে আর পা বাড়াই নি।

কোনোদিন বাড়াবও না!
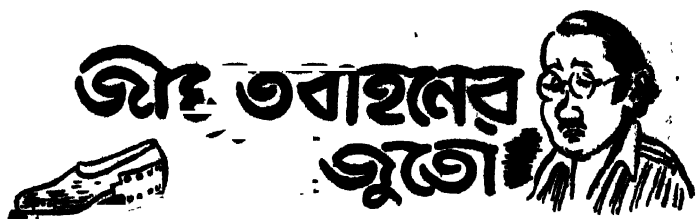
আপিসের নিতাইবাবুর ছেলের বিয়ে ওতোরপাড়ার নিমু ভট্‌চাজের নাত্নীর সঙ্গে। আপিসের সবাই ট্রেনের একটা কাম্‌রা-বোঝাই হয়ে বরযাত্রী সেজে চলেছে; ট্রেনও প্রায় ছাড়্‌-ছাড়্‌। অথচ জীমূতবাহনই এখনো এসে পৌঁছয়নি।

ভজহরি বল্লে: "য়্যাঁ, জীমূতই নাকি এল না শেষটায়! যে কিনা ভোজের গন্ধ পেলেই লাফিয়ে ওঠে—"

"আর খাবার সাম্‌নে দেখ্‌লেই ঝাঁপিয়ে পড়ে—" আরেকজন তাল দিল।

"এমন একটা ভোজ, আর তারই কিনা খোঁজ নেই! আশ্চর্য্য তো!"

ভেবে দেখলে, খুব বিস্ময়কর বইকি! জীমূতবাহন বিয়ের ভোজ উপেক্ষা করবে একথা ভাব্‌তেই পারা যায় না। সুযোগ পেলে, স্বপ্নের মধ্যেও যে পাত পেড়ে খেতে বসে যায়—তারই কিনা এখন পাত্তা নেই! বল্‌তে কি, এর-ওর ঘাড় ভেঙে,

(কখনো কখনো বা নিজেরই গলা কেটে) সারাদিনই তার মুখ চল্‌ছে, এবং যে-সময়টা নিতান্তই ঘুমিয়ে নষ্ট না করলে নয়—সেই রাত্রের ফাঁকেও তার কামাই নেই। বড়ো বড়ো ভোজে হাজিরা দিয়ে, তার সুখস্বপ্নেই, সারারাত তার কেটে যায়!

এহেন জীমূতবাহন, নেহাৎ গঙ্গাযাত্রা করে' না বেরুলে, বরযাত্রীর দলে গরহাজির হবে—এ-ব্যাপার ধারণা করাই কঠিন! দুঃস্বপ্নেও যে-দুর্ভাবনা কারো মনের কোণে ছায়াপাত করে নি, যে-দুর্ঘটনা হয়তো জীমূতবাহনেরও কল্পনার বাইরে, তাই কিনা আজ ঘটে গেল!

কিন্তু না, দুর্ঘটনাটা ঘটল না। ঢং ঢং করে' গাড়ীর ঘণ্টা পড়তে না পড়তেই দেখা গেল জীমূতবাহন আস্‌ছে। ছুটতে ছুটতে আস্‌ছে জীমূত—আর তার জুতো থেকে অদ্ভুত এক আওয়াজ বার হচ্ছে: ঠন্ ঠন্—ঠনাঠ ঠন্!

"জীমূত এসেছে! জীমূত এসেছে!!" আপিসের বন্ধুদের ভেতরে ভারী সোরগোল পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

গাড়ী কিন্তু জীমূতকে ফেলে রেখেই ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু জীমূতও সহজ পাত্র নয়, সেও নাছোড়বান্দা, হন্তদন্ত হয়ে, দৌড়তে দৌড়তে এসে বরযাত্রীর কাম্‌রার হাতলটা খাঁ করে' ধরে' ফেলেছে—এক কামড়েই যুত্ করে' নিয়েছে, বেহাত হতে দেয় নি! এবং ভজহরিও নিজেকে আগিয়ে রেখেছিল, সেও তক্ষনি, দু'হাতে বাগিয়ে, তাকে করায়ত্ত করে' জানালার

ফাঁক গলিয়ে, টেনে হিঁচ্‌ড়ে, ছেঁচ্‌রা ছেঁচ্‌রি করে' কোনো রকমে প্রায় অক্ষত দেহেই তাকে ট্রেনের মধ্যে এনে স্থাপিত করেছে।

"বাব্বাঃ!" বলে' নিজেও বসে পড়েছে ভজহরি। সেই সঙ্গে।

"ছিঃ! ভারী বিচ্ছিরি রকম টান্ মেরেছ তুমি।" বিরক্ত হয়ে জীমূত বলেঃ "ঐ জান্‌লা ছাড়া কি ঢোক্‌বার আর কোনো পথ ছিল না?" জীমূত জান্‌তে চায়।

"বেরুবার একটা পথ ছিল।" বটকেষ্ট বল্‌তে গেছেঃ "গাড়ীর তলা দিয়েই ছিল—মহাপ্রস্থানের পথেই বেরিয়ে পড়বার।"

"হাত পাগুলো সব ঠিক আছে তো? নাক মুখ চোখ?" একটা একটা করে' নেড়ে চেড়ে ছাখে জীমূতবাহন। বাজিয়ে বাজিয়ে দেখে নেয়। "বড্ড লেগেছে কিন্তু!"

"উঃ! কী একখানা লাশ্!" ভজহরি হাঁপ্ ছাড়তে থাকে।

"কেবল এইখানটায়—ওরে বাবা—!" বাজাতে গিয়েই টং করে' আওয়াজ হয়—আর্ত্তনাদ করে' ওঠে জীমূতঃ "—এই ভুঁড়ির জায়গাটায় ভারী ব্যথা পেয়েছি।"

"একটু চুপ্‌সে গেছে বুঝি?" বটকেষ্ট জিজ্ঞেস্ করেঃ "যাক্, তবু যা আছে তাই যথেষ্ট! ওতেও বেশ ধর্‌বে,—দুএক গণ্ডা রসগোল্লা কম পড়তে পারে, কিন্তু তাতে কি আসে যায়?"

"ভজহরি লোকটা ভারী খারাপ!" জীমূতবাহনের তবু রাগ পড়ে না।

ভজহরি বলে : "বাপ্‌স্‌!" এর বেশী কিছু বল্‌তে পারে না। তখনো সে হাঁপ্‌ ছাড়ছে।

"যাক্‌, তুমি এসেছ তাহলে!" কাম্‌রার ওদিকে থেকে কে একজন যোগা ভায় : "এসে গেছ শেষটায়।"

"আস্‌ব না তার মানে?" জীমূতবাহন খাপ্পা হয়ে ওঠে : "তিন ঘণ্টা আগেই এসে পৌঁছতাম! কেবল এই জুতো জোড়ার জন্যেই এত দেরি হয়ে গেল।"

সবাই হাঁ করে' জীমূতবাহনের মুখের দিকে তাকায়।

বটকেষ্ট বলে : "খুঁজে পাচ্ছিলে না বুঝি? না, ওরা পাড়া বেড়াতে বেরিয়ে গেছ্‌ল? কিম্বা সেই রকম—সেই সিরাজদ্দৌলার রাজত্বকালে যা ঘটেছিলো একবার—দু' পাটি ষড়যন্ত্র করে' দুমুখো হয়ে পড়েছিল—সোজা পথে আস্‌তে চাইছিল না?"

"আর বোলোনা ভায়া, সকাল থেকে কি কম হয়রানিটাই গেছে!" জীমূতবাহন এতক্ষণে যুত্‌ করে' বসে : "জুতো মেরামত কর্‌তেই তো এতটা সময় গেল! আমাকে নিজেকেই সার্‌তে হোলো কি না!"

"তুমি নিজেকে সার্‌ছিলে? না, না, কি বল্লে, জুতো তোমাকে সার্‌ছিলো?" না কি—" বন্ধুরা ঠিক সমঝে উঠ্‌তে পারে না।

"জুতোই আমাকে সেরেছে! আর বোলোনা! না সেরে কি করি? মুচিরা কেউ পারল না, পেরে উঠ্‌ল না; একে একে ভয়ে পিছিয়ে গেল। হাত দিতেই সাহস কর্‌ল না তারা। তারা বল্ল,
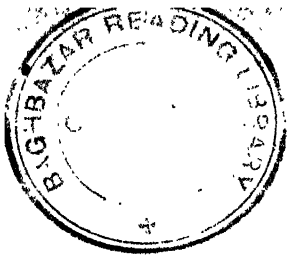
জীমূতবাহনের ট্রেন্‌-প্রাপ্তি !

(পৃষ্ঠা—২৯)

'আমাদের কাজ নয় বাবু! আমরা চামড়া সেলাই করি, টিন্ সেলাই কি করে' করব? টিন্ ঝালাইওলাদের দেখুন্, তারা কর্তে সেক্‌বে, আমাদের কাজ না!' যা বাপু, যা, তোরা যা সেকিস্ সব আমার জানা আছে. যা হাফ্‌সোল্ করিস্ এক বছরও টেঁকে না, যা তালি মারিস্ ছ' বছরও যায় না, যা সেলাই দিস্ ছ' মাসেই ফেঁসে যায়। তোদের কাজ আমার জানা, তোদের দিয়ে সারাতে হলে এই এক জোড়া জুতো আর দশ বছর আমাকে পায়ে দিতে হোতো না? জীমূতবাহন শর্ম্মা তোদের থোড়াই কেয়ার্ করে! স্বাবলম্বী মানুষ হোলো জীমূতচন্দ্র।, কি আর করা? নিজেই উঠে পড়ে লাগা গেল। এই ছাখো না, কেমন বানিয়েছি, নিজে হাতেই পাত মুড়ে পেরেক্ ঠুকে, ছাখো না কেমন হয়েছে! খুব মন্দ হয়েছে কি?"

এই বলে' জীমূতবাহন সকলের (এবং তার নিজের তো বটেই) বিস্মিত সপ্রশংস দৃষ্টি পদস্থ জুতোর দিকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছে।

"—য়্যাঁ, আমার জুতো গেল কোথায়?" সঙ্গে সঙ্গেই বীভৎস এক চীৎকার ছেড়েছে জীমূত: "আমার আরেক পাটি জুতো?"

যুগপৎ সকলেরই চোখে পড়ে, জীমূতের এক পায়ে জুতো নেই।

"জীমূত, তোমার এক পায়ের বাহন?" বটকেষ্ট প্রশ্ন করে: একজন সহচর—"গেল কোথায়?"

জীমূত তার কি জবাব দেবে? শোকাহত হতভম্ব জুতোহারা জীমূত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' তাকিয়ে থাকে কেবল।

"তুমি দু পায়ে জুতো পরে' এসেছিলে তো?" কে আরেকজন জান্তে চায়: "দু' পায়েই পরে' এসেছো? ঠিক মনে আছে তো তোমার?"

"ভুল করে' বাড়ীতে ফেলে আসোনি?" ভজহরি তখনো কপালের ঘাম মুচ্ছিল, সে বল্ল।

"যাও যাও! আর ইয়ার্কি করতে হবে না!" জীমূতবাহন বেজায় রেগে যায়: "কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে—যতো সব ইয়ে—"

"তা গ্যাছে তো কি হবে? ট্রেনে উঠ্তেই গ্যাছে বোধ হয়!" যাদব জীমূতবাহনের দুঃখ লাঘব করার চেষ্টা করে: "গ্যাছে—যেতে দাও! অমন কতো যায়।"

"হ্যাঁ, যায়! গেলেই হোলো কি না! আমার অমন সাধের জুতো, সকাল থেকে ওর পেছনে কত খাটলুম!" জীমূতবাহন হায় হায় করে।

"যাক্, গ্যাছে যখন, ও নিয়ে মন খারাপ কোরো না। গ্যাছে, আবার হবে।" নিত্যানন্দ ওকে সান্ত্বনা দিতে চায়: "থাকলেই যায়।"

"তোমাদের যায় না কেন?" জীমূত আরো চটে' ওঠে: "তোমাদের কেন যাক্ না—সবংশে যাক্—হাজার জোড়া যাক্! আমি দুচোখ ভরে' পরমানন্দে দেখি!"

"কী আর করবে জীমূত? কর্ম্মফল কি কেউ খণ্ডন করতে পারে?" ভজহরি এতক্ষণে একটা কথা বলার ফুরসৎ পায়—কথাটা সে দার্শনিকের মতো বল্‌বার চেষ্টা করে।

"আমার কর্ম্মফল? কর্ম্মফল আমার?—" জীমূত চোখ পাকিয়ে ভজহরির দিকে তাকিয়ে থাকে: "কর্ম্মফল তোমার। না তুমি অমন তাড়াহুড়ো করে' আমায় টেনে তোলো, না এই হয়! আমি ঠিক—ঠিক আমি জানি, ঐ জানালা দিয়ে গলে আস্‌বার সময়ই আমার এই সর্ব্বনাশ হয়েছে। তখনই ঐ জুতো খোয়া গেছে। আমার তখনই নিজেকে কেমন হাল্‌কা হাল্‌কা মনে হচ্ছিল—"

"কিন্তু ভায়া, আমার তো তেমন হাল্‌কা ঠ্যাকেনি।" ভজহরি আরেকবার কপালের ঘাম মুছ্‌ল।

"কি দরকার ছিল আমাকে টেনে তোল্‌বার? কে বলেছিল টেনে তুল্‌তে? কে পায়ে ধরে' সাধ্‌তে গেছ্‌ল? সব তাতে—সব তাতে তোমাদের ফোঁপর-দালালি! যত সব ইয়ে—!" জীমূতবাহন গজ্‌রাতে থাকে: "ছি ছি! এমন কর্ম্ম করে মানুষ? পরের এতখানি অপকার করতে আছে কখনো? আমার এক পাটি জুতো হারিয়ে দিয়ে কী লাভ হোলো তোমাদের শুনি?"

"ভারী তো এক পাটি জুতো! টেনে না তুলে তোমার পা-টিই যে যেত! নিজেই পদচ্যুত হয়ে যেতে যে হে! চাইকি,

খতম্ হয়েই যেতে হয়তো, অক্কা পেতে একেবারে, যা করে' ঝুল্‌ছিলে !"

"যেতাম, যেতাম্, আমি যেতাম ! তোমার কাছে কাঁদ্‌তে আস্‌তাম না তো !" জীমূতবাহন জীমূত-মন্দ্রে ঘোষণা করে। তারপর তার মনে পড়ে যায়, ভজহরি, গোটা-তার কথা ছাড়াও, তা-বাদেও, ভগ্নাংশের বিষয়ে উল্লেখ করেছে।

"পা-টি যেত ? যেত যেত, আমার যেত, তোমার কি ? তোমার তো যেতনা। আমার পা যেত সেও ভাল ছিল, কিন্তু তা না গিয়ে, তার চেয়েও দামী, অত কষ্টের আমার জুতো গেল ! এখন এমন পা থেকেই বা আমার কি লাভ ?"

ভজহরির আর সহ্য হয় না, সেও রুখে ওঠে : "ছেলে মারা গেলেও লোকে এত শোক করে না বাপু ! তোমার তো সামান্য জুতো !"

"সামান্য ! তা তো বল্‌বেই ! তোমাদের কাছেই সামান্য ! আমার দশ বছরের পুরোণো জুতো ! কতদিন ধরে' আমার পায়ে পায়ে ঘুরছে ! তোমাদের কাছে সামান্যই বই কি ! কিন্তু আমি তো জানি, কি থেকে একে কি করে' তুলেছি ! প্রথমে এ কেড্‌স্ ছিল, কিন্তু এখন কেউ একে দেখে তা বল্‌তে পারবে ?" এই বলে' জীমূতবাহন অবশিষ্ট পাটিটিকে পদচ্যুত করে' হস্তগত করলেন : "ছাখো না চেয়ে, দেখলে চেনা যায় ? তারপর এর ওপর কতো চামড়ার তালি পড়েছে ; কতোবার এর সোল্

বদ্‌লেছি আর হাফসোল্ লাগিয়েছি! কত না পট্টির পর পট্টি মেরেছি তবেই না আজ এর এমন চেহারা! এমন হৃষ্টপুষ্ট নধর গঠন!—”

এইবার জীমূতবাহন জুতোটা সবার মুখের ওপরে তুলে ধরলো :

“এ রকম জুতো আর একটিও দেখেছ? বল্‌তে হয় না। জুতোর মতো জুতো যাকে বলে! লাট সাহেবেরও বোধ করি এমন জুতো নেই! কত যত্ন, কত চেষ্টা, কত না মাথা ঘামাতে হয়েছে! কতখানি বুদ্ধি খরচ করতে হয়েছে এর পেছনে! কি রকম প্রাণান্ত করলে এরকম জুতো হয়, ভাবতে পারো? তোমাদের কি? তোমরা তো বলে' দেবে জুতো সামান্য জিনিস! তোমাদের কাছে তাতো বটেই; বলেই তোমরা খালাস! কিন্তু বাপু, পয়সা থাক্‌লেই জুতো কেনা যায় বটে, কিন্তু জুতোকে মানুষ করা চাট্টিখানি কথা নয়!”

জুতোর বর্ণনা শুনে গাড়ীশুদ্ধ সবাই নির্ব্বাক্ হয়ে গেছল। কারো মুখেই একটা কথা ছিল না, সবাই হাঁ করে' সেই একমাত্র পাটিটিকে—জীমূতবাহনের অন্যতম বাহনটিকে—বর্ত্তমান সেই একমাত্র উত্তরাধিকারীকে নির্ণিমেষ নেত্রে নিরীক্ষণ করছিল।

অবশেষে ভজহরির মুখ থেকেই বেরুল :

“জুতোর গায়ে আবার কেরোসিনের টিন্ লাগিয়েছে না কি হে? বাহাদুর তুমি!”

পদচ্যুত জুতোকে হস্তগত করে' জীমূত বল্ল: 'এমন জুতো আর কখনো দেখেছ এর আগে?'

(পৃষ্ঠা—৩৫)

"লাগায় না? না লাগালে হয়? জুতোকে যুৎ মতো করা কি মুখের কথা? যুৎসই করা অম্‌নি নয়! একটা জুতোকে বেঁচেবর্তে টিকিয়ে রাখতে অনেক কাঠখড় পোড়ে—অম্‌নি টেঁক্‌সই হয় না! এটা যাতে আরো দশ বছর অবলীলায় যায় সেইজন্যে আজ সকালেই এদের দুজনের আষ্টে পৃষ্টে টিনের পাত এঁটেছি। টিন্ দিয়ে পেরেক ঠুকে চিরদিনের মতো বাঁধিয়ে নিয়েছি। বিয়ে বাড়ীতে একটা চমক্‌দার জিনিস পরে' না গেলে চলে? আজই এত কাণ্ড, আর আজ্‌কেই এই দুর্ঘটনা ঘটল, হায় হায়!"

"একেই বলে বরাত, জীমূত, একেই বলে বরাত! দুঃখ করে' কি করবে?" কে একজন বলে' উঠল: "কপালের লিখন কে খণ্ডাবে?"

"যা বলেছ তুমি, বরাত!" ফোঁস করে' জীমূত একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে—সমস্ত আফ্‌সোস্ ছেড়ে দ্যায়:

"নইলে ওই হতভাগা ভজহরেটাই বা এই কাম্‌রাতে কেন জুটবে? দরজার কাছটাতেই বা দাঁড়িয়ে থাকবে কেন মুখ বাড়িয়ে? আজ কি ওর নেমন্তন্ন না গেলেই চল্‌ত না? অন্ততঃ এ গাড়ীতে না গেলেই হোতো না? কেন, কাল রাত্তিরে কি ওর পেটের অসুখ হতে নেই? কলেরা হলেই বা কি ক্ষতি ছিল? বরাত ছাড়া আর কি?"

জীমূতবাহনের দ্বিতীয় প্রস্থ হাহুতাশ চলে। ট্রেনের দৈর্ঘ্য প্রস্থ জুড়ে চল্‌তে থাকে। কিছুতেই ওর শোকোচ্ছ্বাস কমে না।

অনেকক্ষণ শোকতাপ করে' জীমূতবাহন একটু জুড়িয়ে আসে। "কিন্তু ভায়া,—" উত্তেজিত স্বরে এবার তার আরম্ভ হয়ঃ "টিন্ লাগিয়ে জুতোটা যা হয়েছিল একখান্! বাজিয়ে দেখতে পারো!"

এই বলে' জীমূতবাহন নিজেই অপর পাটিটিকে, বেঞ্চির ওপরে, পরিপাটিরূপে বাজায়ঃ

"শুনচ কি রকম আওয়াজ্? ঠন্ ঠন্ ঠনাঠ্ ঠন্! যেন ঠন্ঠনের জুতো রে! যেন কারেন্সির আন্কোরা রূপিয়া! আহা, যেমন রূপ, তেম্নি গুণ!—"

বলতে বলতে জীমূতের পুরোণো শোক ফের ঘনিয়ে আসে, ঘন হয়ে জমাট বাধে আবার!—

"কিন্তু, একে রেখে আর কি হবে? এই এক পাটিকে? এক পাটি রেখে লাভ কী? দিই, এটাকেও বিদেয় করে' দি— এটাকেও ভাগাই—"

এই বলে' জীমূতবাহন সেটাকে জানালা গলিয়ে বাইরে পাঠাবার জন্যে উদ্যত হয়।

গাড়ী হুস্ হুস্ করে' চলেছে। সবাই হাঁ হাঁ করে' উঠ্ল!

"আহা আহা! কর কি, জীমূত, কর কি! শোকেতাপে নিশ্চয় তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! নইলে একখানা যাও আছে তাকেও হাতছাড়া করতে যাচ্ছ?"

"একটি মাত্র পাটি! ঐ একটিই তো আছে কেবল! তাকেও

পা ছাড়া করতে চলেছ!" ভজহরি সান্ ছায়: "ভাল করছ কি?"

"ঐ একটিকেই বাঁচিয়ে বর্তে রাখো। আরো মানুষ করে' তোলো।" কে-আরেকজন উপদেশ ছায়: "তোমার ছেলে বড় হ'লে, সেও যদি মানুষ হয়, পায়ে দিতে পারবে। এক পায়েই পরতে পারবে। মরবার আগে তাকে উইল্ করে' দিয়ে, আরামে মারা যেতে পারবে, বন্ধুহে!"

জীমূত একটু ভাবে: "কিন্তু আমার ছেলে কই?"

"ছেলে হয়নি, হবে। হতে কতক্ষণ? জুতোই একবার গেলে আর হয় না, ছেলে তো কতই হয়!"

"কিন্তু এই এক পাটিকে?" জীমূত আরো তলিয়ে ভাবে। "এক পাটিকে রাখ্‌ব?"

"তোমার খোঁড়া ছেলেও তো হতে পারে। এক পায়ে খোঁড়া। এক জোড়ার দরকারই হবে না। খোঁড়া ছেলেই যাতে হয়—জুতোটা যাতে কাজে লেগে যায়—সেই প্রার্থনাই বরং করো ভগবানের কাছে। এখন থেকেই করো!"

জীমূত খানিক ভেবে ছাখে: "না, ভগবানের প্রতি আমার বিশ্বাস নেই। ভগবান কি মুখ তুলে চায়? তাহলে কি আমার এই এক পাটিই যেতো? গেলেও নিশ্চয় ফিরে আসত আবার! না, ভগবানকে আমি বিশ্বাস করি না। এ পাটিও আমি রাখব না।" এই বলে' জীমূত জুতো সমেত হাত তুল্‌ল।

"থামো, থামো! করো কি! যাকে রাখো সেই রাখে, জানোনা?" যাদব ফের বাধা ছায়ঃ "সাম্ থিং ইজ্ বেটার্ দ্যান্ নাথিং!"

"হাফ্ এ লোফ্ ইজ্ বেটার্ দ্যান্ নো লোফ্!" ভজহরি তালিম দিল ঃ "এক পায়ে পরে' হাঁটবে, তুমিই হাঁটবে, ক্ষতি কি?"

"আমাকে কি তোমরা লোফার্ পেয়েছ নাকি? এক পায়ে জুতো পরে' হাঁটব? কেউ হাঁটে নাকি? হাঁটতে দেখেছ কাউকে? একে রেখে কেবল দুঃখ বাড়ানো! একে দেখলেই, যতই দেখব ততই আমার বুক হু-হু করে' উঠবে। না, সে দৃশ্য আমার সহ্য হবে না। যখন একজন আমার বুক খালি করে' গেছে, আমার মুখের দিকে না তাকিয়ে, আমার মায়া কাটিয়েই চলে গেছে, তখন এও যাক্! দূর হোক্!—"

এই বলে' জীমূতবাহন একটানে জানালা গলিয়ে জুতোটাকে ধাবমান এক ঝোপের মধ্যে পাঠিয়ে দিল।

"জুতোর বিয়োগে জীমূত বেচারী বাঁচেই কিনা কে জানে, আর বাঁচেও যদি, আজন্ম আর দাড়ি কামাবে না নিশ্চয়!" ভজহরি দুঃখ করল ঃ "সেই যার শাল গেছল তার মতো!"

"কামাবই না তো! বাকী জীবনটা খালি পায়েই কাটিয়ে দেব! অমন জুতো যার যায় সে কি আর অন্য জুতোর দিকে কখনো মুখ তুলে তাকায়?" জীমূত তার পরলোকগত জুতোর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে থাকে।

"সারা জীবন খালি পায়ে কাটিবে দেবে? বলো কি, জীমূত? অবাক্ করলে! বাপ মারা গেলেও যে লোকে, দশ দিনের বেশি—"

বল্‌তে বল্‌তে ওতোরপাড়া এসে পড়ল।

জীমূতবাহন নাম্‌ল সবার শেষে, ভগ্ন হৃদয়ে, ধীরে ধীরে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই রেলগাড়ীর হুইস্‌লের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার আবার এক আর্ত্তনাদ শোনা গেল:

"য়্যাঁ! এই যে আমার সেই জুতো! সেই আরেক পাটিটা! চুপটি করে' এখানে ঘাপ্‌টি মেরে আছে!"

সকলে সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল, জীমূতচন্দ্রের সেই আরেক পাটি গাড়ীর পাদানিতে দিব্যি আরামে লট্‌কে রয়েছেন!

সেই আরেক পাটি ঠনাঠ্‌ ঠন্!...

* এই গল্পটির প্লট 'এক রোমাঞ্চকর অ্যাড্‌ভেঞ্চার' এবং 'কেবল হাসির গল্প' প্রভৃতি বইয়ের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার সুলেখক শ্রীমান্ ধ্রুবেশ চন্দ্র অধিকারীর কাছ থেকে পাওয়া।
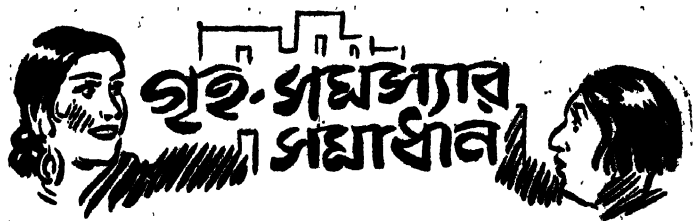
"এবার গ্রীষ্মের বন্ধে যাচ্ছো নাকি কোথাও?" নিবারণ এসে জিজ্ঞেস করল আমায়।

"না, কোথায় আর যাব!" আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলি, "চেঞ্জে টেঞ্জে যাওয়া বৃথা! কোথাও মনের মত বাড়ী মেলে না! বিজ্ঞাপন দেখে, স্বর্গ মনে করে' গিয়ে উঠি, পরে অনেক উপসর্গ দেখে পালিয়ে আস্‌তে ইচ্ছা করে। আস্তে আস্তে বিস্তর খুঁৎ বেরিয়ে পড়ে, দেখা যায় আস্ত একটা আঁস্তাকুড়! ঠকে ঠকে আর ঠেকে ঠেকে সেয়ানা হয়ে উঠেছি ভায়া!"

"তা বটে!" নিবারণও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্থায়।

"কেন তুমি কোথাও যাচ্ছ নাকি?" জিজ্ঞেস করি আমি।

"কোথায় আর যাই! যাবার মধ্যে তো সেই এক গোবিন্দপুর! গোবিন্দপুরের সেই বাড়ীটা। সেই যে বাড়ীটা, কাকা দেহ রক্ষার সময়ে দয়া করে' আমায় উইল করে' দিয়ে গেছেন। কিন্তু সেখানে যেতে আমার মন সরে না।" নিবারণ জানায়।

"কেন, গোবিন্দপুরেই যাওনা কেন! গোবিন্দপুর তো ভালোই হে! পাড়া গাঁ ঢের ঠাণ্ডা! শরীরেও বেশ মুটিয়ে আসবে।"

"ও বাবা! ও যা বাড়ী! দুদিন থাকতে হলেই গেছি। এক মাসে আধখানা হয়ে আসব। পাছে চামচিকেরা বেদখল করে' নেয়, অমন একটা দামী ভূসম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যায়, সেই ভয়ে এর আগে বার কয়েক সেখানে গিয়ে বাস করে' এসেছি বটে। গেল গ্রীষ্মের বন্ধেও তো গেছি কিন্তু এবার আর না।"

"কেন, এবার কি হোলো?"

"বাড়ীটার অনেক গুণ! সেকেলে স্যাবেক আমলের বাড়ী, বহুদিন তার মেরামত হয়নি। কেবলি মনে হয় এই বুঝি হুড়্ মুড়্ করে' সব শুদ্ধ ঘাড়ে এসে পড়ল।" নিবারণ দুঃখ করে: "ভেঙে পড়বেও কোনোদিন! হয়তো এই বর্ষাতেই!"

যদিও আমার ব্যক্তিগত আশঙ্কার কোনই কারণ ছিল না, তবু নিজের অজ্ঞাতসারেই, একবার নিজের ঘাড়ে হাত বুলিয়ে নিলাম।

"যত সব তোমার কুসংস্কার! অমন একটা খুড়তুত সম্পত্তি কি ক্যালনা হে? কার কাকা কজনকে দিয়ে যায় শুনি? হেলা ফেলা করতে আছে? ছিঃ!"

কিন্তু নিবারণ কোনো উৎসাহ পায় না: "নাঃ, গোবিন্দপুরে যাচ্ছিনে। প্রাণ গেলেও আর না! তবে একটা মৎলব মনে এঁটেছি—"

'অতি প্রাচীন পুরাকীর্ত্তিসঙ্কুল প্রকৃতির সেই লীলা নিকেতন—!'

(পৃষ্ঠা—৫০)

"বেচে ফেল্‌তে চাও? বেচে ফেল্‌বার মৎলব করেছ?"

"কেউ কিন্‌লে তো! বহুবার চেষ্টা করেছি, বিজ্ঞাপনও দিয়েছি বহুৎ; কোনো ফল হয়নি। খদ্দেররা যতো অখদ্দে!"

"ভারী দুঃখের কথা! কেন, কিন্‌ছে না কেন?"

"বাড়ীটার চতুঃসীমায় কোনো ইঁদারা কি পুকুর কিচ্ছু নেই। ভারী জলকষ্ট। সেও একটা কারণ বই কি! বাগানের মাঝ-খানে একটা টিউব্ ওয়েল্ রয়েছে বটে, কাকাই বসিয়ে ছিলেন, কিন্তু সেটা খাটানোই আছে, তার কোনো খাটুনি নেই। তার খেয়াল মতো খুসী মতো সে জল ছায়। পাম্প্‌টা কখন যে ঠিক আর কখন বেঠিক তার কোনো ঠিক নেই—কপাল খুল্‌ল তো কল খুল্‌ল! জল পেলে! নইলে এই দারুণ গরমে শুকিয়ে মরো!"

"ভারী বিচ্ছিরি তো! গ্রীষ্মের বন্ধে ওখানে যাওয়া আর সাহারা ভ্রমণে বার হওয়া একই কথা দেখ্‌চি!"

"সেই কথাই তো বলছি হে!" নিবারণ আক্ষেপ করে: "আবার ওধারেও আছে! বর্ষাকালে ফুটো ছাত দিয়ে হুস্ হুস্ করে' জল পড়ছে। তখন যতো জল চাও!"

"এক কাজ করোনা কেন? নতুন একটা নলকূপ বসিয়ে, বাড়ীটাকে সারিয়ে সুরিয়ে, বোকা হাবা কাউকে একটা পাক্‌ড়ে, ধরে বেঁধে বেচে দাও না কেন?"

"বাড়ীটা সারাতে যা খরচ পড়বে, তার সিকি দামেও কেউ কিনতে চাইবে না। সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

"তাহলে আর কি মৎলব এঁটেছ? বেচ্‌বেও না যদি?"

"ভাবচি, খবরের কাগজে ভাড়াটের বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখি। অনেকে তো পাড়াগাঁয় বায়ু পরিবর্ত্তন করতে যায়, পাড়াগাঁর আব্‌হাওয়া পছন্দই করে। তাদের এক আধ জন টোপ্ গিল্‌লেও গিল্‌তে পারে। আর এদিকে আমি তিন মাসের ভাড়ার টাকাটা আগাম না; বাগিয়ে নিয়ে না, এই নিদারুণ গ্রীষ্মকালটা, শিলং কি দার্জ্জিলিং কোথাও গিয়ে আরাম করে' কাটিয়ে আসি গে।"

"হ্যাঁ, এটা খুব ভালো মৎলব বটে।" আমি মান্‌তে বাধ্য হই।

"এই ছ্যাখো না, দৈনিক কাগজে দেবার জন্যে একটা মক্‌শো করেও রেখেছি—" নিবারণ আমাকে মুসাবিদাটা ছ্যাখায়: "ভাড়া খুব বেশী চাইনি, পঞ্চাশ টাকা মাসিক। তিন মাসের দেড়শ টাকা অগ্রিম দেয়। খুব মন্দ কি?"

নিবারণের সাহিত্যচর্চ্চাটা দেখি। চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারি কিচ্ছু হয়নি! কোনো কাজেরই হয়নি এটা। পাব্‌লিসিটি একখানা আর্ট। দস্তুরমতই একটা কথাশিল্প—বল্‌তে কি! সবার দ্বারা হবার নয়। এবং তা যে হয় না স্পষ্ট বাক্যেই আমি নিবারণকে সে কথা জানিয়ে দিই।

"তুমি যে ভাষায় খস্‌ড়াটা ফেঁদেছ তাতে কেউ পট্‌বে বলে' মনে হয় না। ভুলেও কেউ এ-ফাঁদে পা দেবে কিনা সন্দেহ! তোমার বাড়ীর যে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তত বেশী আকর্ষণ নেই,

যেমন খুব চমৎকার নয় সে লোর উল্লেখ নাই করলে! সে সবের ব্যাখানা না করাই ভালো। যেমন তোমার ঐ ফুটো ছাদ, ফাটা পাম্প্—ইত্যাদি। তার বদলে যেগুলো বাড়ীটার ভালোর দিক কেবল সেই দিকেই যদি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করো—”

“বাড়ীটার ভালোর দিক কিচ্ছু নেই।”

“বোকার মতো কথা কইছ! সব জিনিষেরই ভালো মন্দ দুটো দিকে আছে। দাঁড়াও, আমি তোমাকে সাহায্য করছি, কি করে’ বিজ্ঞাপনটা লিখ্‌লে একেবারে অব্যর্থ হবে বাৎলে দিচ্ছি তোমায়। আচ্ছা, গোবিন্দপুর জায়গাটা কলকাতার আশপাশ থেকে বেশ অনেকটা দূরে, কেমন নয় কি?”

“তা না হলে ধাধ্‌ধাড়া গোবিন্দপুর বলেছে কেন?” নিবারণ আমার অজ্ঞতার বহরে অবাক্ হয়।

“আচ্ছা, তাহলে এই বলে’ ঘোষণা করতে হবে যে কলকাতা থেকে ঢের দূরে, বেশ নিরাপদ ব্যবধানে—যেখানে বোমা টোমা পড়ার বা বিমাণ-আক্রমণ হবার বিন্দুমাত্রও কোনো সম্ভাবনা নেই—এই গোছের—এই জাতীয় একটু ইঙ্গিত করে’ দিতে হবে।”

“সে কথা মন্দ নয়।” নিবারণ স্বীকার করে: “এই হুজুগের মুখে, এই হিড়িকে কারু না কারু মন টান্‌তে পারে!”

“জানালা থেকে বাইরের দৃশ্য টিশ্য কেমন?”

“খালি বাঁশঝাড় আর আমবাগান। রাবিশ্!”

“তাহলে লিখ্‌তে হবে, বাতায়নপথে সবুজ বনানীর

নীচের ঘরে বসে' অনেক কিছুই বসাচ্ছেন !

(পৃষ্ঠা—৫২)

অনির্ব্বচনীয় শোভা—বেতসকুঞ্জের চিরনবীন শ্যামলতা—প্রাকৃতিক সুষমার অফুরন্ত খনি, প্রকৃতিদেবীর লীলা নিকেতন—ইত্যাদি ইত্যাদি !”

“হুঁ। বেশ হবে, কাজ হবে বলে' মনে হচ্ছে।” ক্রমশঃ নিবারণের উদ্দীপনা দেখা যায়।

“আশে পাশে দেখবার মতো জিনিস কিছু আছে? এই ধরো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কি তাজমহলের মতো ঐতিহাসিক কোনো দ্রব্য—কোনো দ্রষ্টব্য ?”

“কোশ দশেক দূরে বহু প্রাচীন একটা দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পড়ে' আছে বলে' শুনেছি। কোনোদিন দেখতে যাইনি। রাজা গণেশ না কার আমলের সেটা নাকি কেল্লা ছিল। এখন কেবল তার একটা দেয়ালই শুধু রয়ে গেছে, এই রকম শুনেছি, আর তার চারধারে নাকি গুচ্ছের ইটের পাঁজা। ইটের পাঁজা না বলে' ইটের সমাবেশ বল্লে হয়তো লোকে আকৃষ্ট হতে পারে, কি বলো? তাহলে তাই লিখে দাও, কিন্তু ভাই, একেবারে যতো সেকেলে ইট—কোনো কাজের না! মানুষ খুন করা ছাড়া কোনো কাজে লাগবে না।”

“সেই যথেষ্ট! ‘ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রাচীন-কীর্ত্তি-পরিপূর্ণ পল্লীগ্রাম-অঞ্চলে অবস্থিত’ এই কথাটা খাপ্ খাইয়ে যুৎমতো বসিয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ, ভালো কথা, ষ্টেশন, ডাকঘর, ডাক্তারখানা, থানাটানা, এ সব বেশ কাছাকাছি তো?”

"সাত মাইলের মধ্যে না। আশে পাশে জনমনিষ্যি নেই!"

"আরো ভালোই হোলো তাহলে! জানিয়ে দাও, সংসারের, সভ্যতার কলহ-কোলাহল-কলরব থেকে দূরে, বহুদূরে, শান্তিপূর্ণ আনন্দময় প্রকৃতির লীলানিকেতনে যদি সত্যিকারের বিশ্রামসুখ উপভোগ করতে চান তাহলে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অতি-প্রাচীন-পুরাকীর্ত্তিসঙ্কুল সুরম্য এই গোবিন্দপুরে—দাঁড়াও সমস্তটা আমি ভালো করে' ছকে দিয়ে যাচ্ছি। বলে, কথায় যদি চিঁড়ে ভেজাতে না পারলাম তাহলে বৃথাই এতদিন সাহিত্য-চর্চ্চড়ি করেছি!"

"বেশ, এইটাই তাহলে খবরের কাগজে পাঠিয়ে দেব। কেউ না কেউ টোপ্ গিলবেই, কি বলো?"

"গিলতেই হবে। কিন্তু খবরের কাগজে না। কাগজের বিজ্ঞাপনে কেউ বিশ্বাস করেনা আজকাল। বার বার ঠকেছে কিনা, আমার মতই ঠকে রয়েছে। ঠকে চটে-মটে রয়েছে।" আমি তাকে বাৎলাই: "তার চেয়ে বরং চেনা শোনা বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে চিঠির মতো করে' বিলি করো। বেছে বেছে, বোকা দেখে দেখে, একে একে, পত্রাঘাত করো। গ্যাখো ফল হয় কিনা! বিজ্ঞাপনের ভাষায় চিঠি লিখে, শুভেচ্ছা জানিয়ে, ডাকে ছেড়ে দাও, ব্যাস্!"

তারপর, দিন সাতেকের জন্যে কি একটা কাজে কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিল। বাড়ী ফিরে, সিঁড়িতে পা বাড়াতেই উঁকি

মেয়ে দেখি, আমাদের নীচের ঘরে, একটি ছোট্ট মেয়ের মুখোমুখি বসে' মুশ্‌কো একজন ভদ্রলোক অনেক কিছুই বসাচ্ছেন। মেয়েটিকে চিনি চিনি ঠেক্‌ল, কিন্তু খুব মিঠে বলে' বোধ হোলো না আমার।

আড়াল দিয়ে পাশ কাটিয়ে উপরে উঠে গেলাম। বিনির সঙ্গে চোখাচোখি হইতেই সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ছুটে এল :

"দাদা! দাদা! গৃহ-সমস্যার সমাধান হয়েছে! মাসীমাদের আর আমাদের একসঙ্গেই! তুমিতো পছন্দসই বাড়ী পাও না বলে' কলকাতার বাইরে পা বাড়াতেই চাওনা!, আমি এইখানে এই ঘরে বসেই দিব্যি একটা বাড়ী ঠিক করে' ফেলেছি। তিনমাসের ভাড়া আগাম পাঠিয়ে এর মধ্যে বাগিয়েও ফেলেছি। ভাড়াও খুব বেশী নয়, পঞ্চাশ টাকা মাসে, পাছে আর কেউ চট্ করে গিয়ে গেঁথে ফ্যালে, সেইজন্যে টাকাটা টি-এম-ও করেই পাঠিয়ে দিলাম।"

"বলিস্ কি? কোথায় এই ভূ-স্বর্গ আবিষ্কার করলি?" আমি দমে গিয়েও বিস্ময় দমন করতে পারিনে।

"তোমার বন্ধু নিবারণবাবু তাঁদের গোবিন্দপুরের বাংলোটা ভাড়া নেবার জন্যে তোমাকে চিঠি লিখেছিলেন। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেউ যদি চেঞ্জে যায়, তাহলে একশ টাকার জায়গায় পঞ্চাশটাকা ভাড়াতেই তিনি বাড়ীটা ছেড়ে দিতে রাজি আছেন। সত্যি, ভারী ভালো লোক আমাদের নিবারণবাবু, বড্ড বন্ধুবৎসল!"

‘কেমন দাদা, এক চোটে সব্বাইকার গৃহ-সমস্যার সমাধান—কি বলো ?’

(পৃষ্ঠা—৫৪)

নিবারণের বন্ধুবাৎসল্যে আমার বাক্‌শক্তি তখন তিরোহিত—ওর কথার কী জবাব দেব ভেবে পাচ্ছিনে।

বিনি বিনিয়েই চলে : "...যাক্, ভালোই হোলো। মাসীমাও ক্রণিক্ ব্যায়রামটার চিকিৎসার জন্যে অনেকদিন থেকেই কলকাতায় আসব আসব করছিলেন। ভালো বাড়ী জুট্‌ছে না বলেই আস্‌তে পাচ্ছিলেন না। মাসতিনেকের জন্যে আমাদের ফ্ল্যাট্‌টা তাঁকে ছেড়ে দিতে পারি, গোবিন্দপুরের বাড়ীটা ভাড়া করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে লিখে দিয়েছিলাম। তিনচার দিনের মধ্যেই মাসীমারা এসে পড়বেন, তার মধ্যে আমরাও এদিকে বেরিয়ে পড়তে পারব। পারবনা? কী বলো? একচোটে সবাইকার—সকলের গৃহ-সমস্যার সমাধান করতে পারা গ্যাছে। কী বলো দাদা?......"

বিনি বক্‌বক্ করে' বলে' যায় : "মেসোমশাই দুদিন আগেই এসে পড়েছেন। আমাদের টিনিকে সাথে নিয়ে। টিনি আর সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়েটি নেই দাদা! ওকে দেখ্‌লে তুমি চিন্‌তে পারবে না। দ্যাখো না গিয়ে, এখন তো ড্রইংরুমে বসে' চা খাচ্ছেন...টিনি আর তিনি!......"

আমার কাণে ওর অত কথার একটিমাত্র প্রতিধ্বনি এসে লাগে কেবল : "ধাধ্‌ ধাড়া গোবিন্দপুর...ধাধ্‌ ধাড়া গোবিন্দপুর ...ধাধ্‌ ধাড়া.........!"

নিবারণ, এই কি, তোমার বন্ধুকৃত্য?
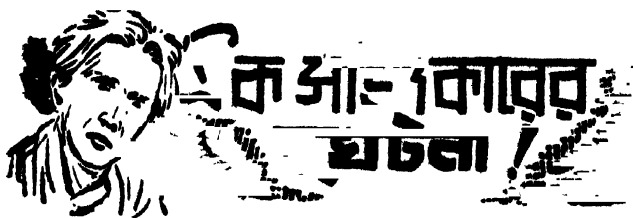
এই গল্পটি, তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় লেখক শ্রীযুত হেমেন্দ্র কুমার রায়—আমাদের হেমেনদার—মুখ থেকে শোনা। গল্পটি অতুলনীয় সাহিত্য-স্রষ্টা শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে। তাঁর লেখা কোনো বই কি তোমরা পড়েচ ? বড় হবে যখন, তখন খুবই পড়বে। এবং তাঁর লেখা এত ভালো লাগ্‌বে যে, তখন হয়তো আমাদের কারো লেখাই তোমাদের ভালো লাগবে না। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে বড়ো হয়ে যেমন ছোটবেলার বন্ধুদের ভুলে যায়, তেম্‌নি বেমালুম আমাদের ভুলে যাবে। কিন্তু দুঃখ করে' কি লাভ ? তখনও আরো ছেলেমেয়েরা আস্‌বে নাকি ? আমাদের লেখা, বড়-হয়ে-যাওয়া তোমাদের কাছে তখন অখাদ্য হলেও, তারা তো তখনই কিছু আর রবীন্দ্রনাথ কিম্বা শরৎচন্দ্রের নাগাল পাচ্ছে না, অগত্যা আমরাই তাদের গালে পড়ব। এইটুকুই কি কম সান্ত্বনা ?

তবে শরৎচন্দ্রের দু' একখানা বই এখনো তোমরা পড়তে পারো। তাঁর 'বিন্দুর ছেলে' আর 'ছেলেবেলার গল্প' পড়ে

দেখো। অত মিষ্টি, অমন নিখুঁৎ, ওরকম চমৎকার লেখা আর হয় না।

রূপকথায় আছে, কবে নাকি, উঁচু একটা ফুলের গাছ ঊর্দ্ধবাহু শিশুর আবেদনে, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে—কচি ছেলের কচকচি সহ্য করা সহজ নয় তো!—তার একটা ফুলন্ত ডাল হঠাৎ নামিয়ে দিয়েছিল—অবশ্যি চার ধারে তাকিয়ে, কেউ কোথাও দেখছে কিনা ভালো করে' দেখে নিয়ে। এই তুটি বইও তেম্‌নি, তোমাদের ডাকে, বনস্পতির ডাল নামিয়ে দেয়া। মহীরুহর ছোট্ট মুঠোয় আসবার লোভ!

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এই মজার গল্পটি কি করে' শুনতে পেলাম এবার বলি। সম্প্রতি রংমশালে 'জীমূতবাহনের জুতো' বলে' আমার একটা গল্প বেরিয়েছিল। গল্পটি পুরোপুরি আমার নয়। ধ্রুবেশ অধিকারী বলে' তোমাদেরই মতো ছোট্ট একটি বালকের কাছে শোনা—তাদেরি কে-এক রামহরিবাবুর নিজের জীবনে-ঘটা সত্যিকারের কাহিনী—এক আজীবনের তুর্ঘটনা! তার মুখের গল্পটা, আমার কলমের মুখে এনে, এক আধটু রং চড়িয়ে, 'জীমূতবাহনের জুতোয়' আমি ফলাও করেছি। (সেই জুতো এই বইয়েই তোমরা পড়তে পাবে।) এবং আমার সেই গল্পটি দেখেই, হেমেনদা, প্রায় সেই ধরণেই, এই আরেকটি গল্প আমাদের শুনিয়েছেন।

এবং এও এক জুতো হারানোর গল্প!

'আমি কি করে' জানব ? আমি কি নিয়েছি ?' বল্লেন শরৎচন্দ্র।

(পৃষ্ঠা—৫৯)

এবং যার তার জুতো নয়—খোদ্ শরৎচন্দ্রের জুতো !

শরৎচন্দ্র থিয়েটারে বসে' অভিনয় দেখ্‌ছেন। তাঁর নিজের বইয়েরই অভিনয়। তাঁর নিজস্ব নাট্য-কীর্ত্তি ! অভিনয় করছেন শিশিরকুমার এবং স্বয়ং তাঁরই প্রযোজনা। আর ওঁর মতো —শিশিরকুমারের মতো—ও-রকম অভিনয় আর কে করতে পারে ?

একটা কুশন্ চেয়ারে আরাম করে' বসে' শরৎচন্দ্র নিজের বইয়ের শিশির-সুলভ অভিনয় দেখ্‌ছেন। গদ্‌গদ হয়ে দেখ্‌ছেন। তাঁর সঙ্গে অন্যান্য জ্ঞানীগুণী শিল্পী এবং সাহিত্যরথীরাও ছিলেন। হেমেন্দ্রকুমার তো ছিলেনই, বুঝতেই পারছ !

থিয়েটার ভাঙল। বাইরে এলেন সবাই। শরৎচন্দ্রও। ওঁরই বই, অমন বই, আর তার ওইরূপ সুচারু অভিনয়—তবু মনে হোলো, তিনি যেন তেমন খুসী নন্।

শরৎচন্দ্রের এই বৈরাগ্যের—এই বৈলক্ষণ্যের কারণ কি ?

সকলেরই এটা দৃষ্টিগোচরে এল এবং সকলেই একটু ভাবিত হলেন।

ওঁদের একজন শরৎচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে—তাঁর আপাদমস্তক লক্ষ্য করে' চম্‌কে উঠ্‌লেন হঠাৎ। তাঁর নজরে পড়ল, শরৎচন্দ্রের —না, এমন কিছু নয়। অঙ্গহানি নয় ঠিক। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অন্তর্গত করা গেলেও, জিনিষটাকে ঠিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অন্তর্গত বলা চলে না।

"একি, দাদা! আপনার এক পাটি জুতো কি হোলো?" তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—শরৎচন্দ্রের ইতর-বিশেষ প্রথমে যাঁর প্রত্যক্ষ হয়েছিল—"আরেক পাটি পাম্পশু?"

"আমি কি করে' জানব?" শরৎচন্দ্রের গলায় বেশ একটু রুক্ষতার রেশ: "আমি কি নিয়েছি নাকি?"

"না না, সেকথা বলছি নে—" অনুসন্ধিৎসু একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন: "সেকথা বলেছি কি? বলছি, গেল কোথায়?"

"যেখানেই যাক্, চোর ব্যাটাকে সুবিধে করতে দিচ্ছি নে। সে ভেবেছে এক পাটি না পেলে আমি আরেকটা ফেলে রেখেই চলে যাব, আর তিনি তখন এসে দুপাটি বাগিয়ে পরিপাটি মজা লুটবেন, সেটি হচ্ছে না। আমি কিন্তু এর এই এক পাটিও ছাড়ছি নে।"

সবিস্ময়ে সকলে তাকিয়ে দেখলেন, শরৎচন্দ্রের এক পায়ে পাম্পশু।

দামী পাম্পশু জোড়াটা, ওই ভাবে বিজোড় হয়ে যাওয়ায়, সকলের মনেই জোর বেদনা লেগেছে সবাই জানাতে লাগলেন।

শরৎচন্দ্র বল্লেন: "চোর ভেবেছে, সে খুব চালাক্! খুব লাভ বাগাবে? আমি এই এক পাটিই বগলদাবা করে' নিয়ে চল্লুম।"

এই বলে' শরৎচন্দ্র সেই এক পাটি পাম্পশু পায়ে দিয়েই পথে নাম্‌লেন।......

সে-সময়ে শরৎচন্দ্র থাক্‌তেন বাজে শিবপুরে।

অত বড়ো সাহিত্যরথী শিবপুরের যে অংশে বাস করতেন তার নাম 'বাজে-শিবপুর' কেন দেয়া হয়েছিল, যদি শরৎচন্দ্রের হেতুও না হয়ে থাকে, তাঁর ওখানে আস্‌বার আগেকার নামই হয়, তবু তিনি পদার্পণের পরেও কেন যে ঐ বদ্‌নাম বদ্‌লে দেয়া হয়নি সে আমার কাছে এক সমস্যা ! যাক্‌, তার সমাধানের ভার, বাজে-শিবপুরের বাসিন্দারের ওপরে ছেড়ে দিয়ে, আসল গল্পে আসা যাক্‌ এখন।

তার পরদিন শিশিরকুমার শরৎচন্দ্রের বাড়ী এলেন।

আসতেই দরজার গোড়াতেই, চিরাচরিত প্রথায়, এক ভয়াবহ অভ্যর্থনা তাঁর ভাগ্যে ঘট্‌ল !

না, স্বয়ং গৃহস্বামীর কাছ থেকে নয়; শরৎচন্দ্রের এক মারাত্মক কুকুর ছিল, নাম তার ভেলি। কর্ত্তার কাছে কেউ এলেই, দরজার কড়া নড়লেই, সে সগর্জ্জনে তাড়া করে' আসত। ভেল কিছু, ভ্যাজাল কিছু, আদপেই সে সইতে পারত না। এই জন্যেই শরৎবাবু তার ঐ অনুপম নামকরণ করেছিলেন কিনা, কে জানে ! (শোনা যায়, না-পছন্দ হওয়ায়, শরৎচন্দ্রের একখানা নভেলকেও সে নাকি ছিঁড়ে খুড়ে একশা করেছিল !)

শিশিরকুমার সেই সম্বর্দ্ধনা অতিক্রম করে' কোনোরকমে তো শরৎচন্দ্রের কাছে এসে পৌঁছলেন।

বগল থেকে একটা প্যাকেট বার করে' তিনি বল্লেন: "এর মধ্যে কী আছে—আন্দাজ করতে পারেন দাদা ?"

শিশিরকুমার বল্লেন, 'এর মধ্যে কী আছে, আন্দাজ করতে পারেন শরৎদা ?'

(পৃষ্ঠা—৬০)

"কোনো খাদ্যদ্রব্য ?" শরৎচন্দ্র সন্দিগ্ধ নেত্রে তাকালেন।

"ঠিক খাদ্যদ্রব্য না হলেও, একেবারে অখাদ্য দ্রব্য নয়।" এই বলে' শিশিরকুমার সেই প্যাকেট উন্মোচন করলেন: "আপনার সেই আরেক পাটি !"

আরেক পাটির দর্শনমাত্রই শরৎচন্দ্র দুঃখে ভেঙে পড়লেন।

"শিশিরকুমার, শেষে তুমিই—তুমিই শেষে—?" তাঁর ভগ্ন কণ্ঠ থেকে ভেঙে ভেঙে বার হোলো: "শেষে কিনা—তুমিও—?"

শিশিরকুমার একটু হক্‌চকিয়েই যান্। ঠিক বুঝতে পারেন না।

"তোমারই এই কাজ !" শরৎচন্দ্রের কণ্ঠের আরো ভগ্নদশা: "আমি যে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি !—"

"না না, আমি নই। আমি না দাদা, আপনি যে কুশনে বসেছিলেন, তারই তলায় এটা—"

"সেই কুশনের তলায় পড়ে' ছিল—বলো কি ? তবে যে আমি অতোক্ষণ ধরে পা দিয়ে ভালো করে' হাতড়ালুম—পেলুম না তো ?"

"তলায় তো পড়েছিল না ! কি করে' তার ভেতরে সেঁধিয়ে গেছ্‌ল। আজ সকালে কুশন্ তুল্‌তেই বেরিয়ে পড়েছে।"

"উঃ, কী বিশ্বাসঘাতকতা ! এতদিন ধরে' এক সাথে থেকে, পায়ে পায়ে ঘুরে এতদূর ছলনা ! নাঃ, সামান্য জুতোর ওপরেও আর আস্থা রাখা যায় না। কালে কালে হোলো কি ?" দীর্ঘনিশ্বাসের সাথে সাথে তাঁর মুখ থেকে বার হয়।

"জুতোর আর কি দোষ ? কুশন্‌টাই দায়ী।" শিশিরকুমার

জুতোর পক্ষে সাফাই গান—পরের জুতোর মুখ বাঁচাতে নিজের কুশনের ঘাড়ে সব দায় চাপিয়ে ছ্যান্।

"এই জন্যই কুসঙ্গে মিশ্তে নিষেধ। কুসঙ্গে মিশেই জুতো বেচারা—ঠিক বলেচ তুমি! কুসঙ্গের গ বাদ দিলে, প্রায় সবখানিই তো কুশনের মধ্যে রয়েচে কি না!"

"যাক্গে শরৎদা, আপনার জুতোর জোড় মিলিয়ে দিলুম, এখন কী খাওয়াবেন, বলুন্!" বল্লেন শিশিরকুমার।

"খাওয়াব কি? সে আর নেই।" শরৎচন্দ্র আক্ষেপ করলেন। "সে আর হোলো না!"

"খাবারের জিনিষের বাজার বন্ধ বল্ছেন?" শিশিরকুমার একটু বিস্মিতই। "কেন, আজ কি হরতাল না কি?"

"না, সেই আরেক পাটি নেই আর।—" শরৎচন্দ্রের করুণ কণ্ঠঃ "সেই কথাই বল্ছি।"

"নেই! কে আবার নিয়ে গেল?" শিশিরকুমার এবার আরো বেশি অবাক্ হন্ঃ "সে পাটিটা আবার এর মধ্যেই খোয়া গেছে নাকি? বলেন কি? য়ঁ্যা?"

"খোয়ার্ আর বলো কেন? আমি নিজ হাতেই তার সর্ব্বনাশ সাধন করেছি। কাল হাওড়াপুল পেরিয়ে আসবার সময় ভাবলুম, এটাকে, এই একপাটিকে সঙ্গে রেখে আর লাভ? চোর হয়তো এই এক পাটির লোভে লোভে আমার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়ে ধাওয়া করবে। এবং এইটা নেবার সুযোগে, সেই ছুতোয় আরো

ক'পাটি সরাবে কে জানে ! দরকার কি, দিই একে চোর-ছ্যাচোরের নাগালের বার করে'—একেবারে—''

"এই বলে' শেষে কি—? শেষে কি আপনি—?" শিশির-কুমারের রুদ্ধ নিশ্বাস থেকে এর বেশী আর কিছু বেরয় না।

"হ্যাঁ, দিলুম ব্যাটাকে গঙ্গাযাত্রা করিয়ে! নিজ হাতেই জলাঞ্জলি দিলুম। কি করব ?"

শরৎচন্দ্র ঠিক কি ভাষায় কথা কইতেন আমার মনে নেই—কাজেই আমার নিজের ভাষাতেই গল্পটা আমি লিখেচি। তাঁর সঙ্গে কখনো-সখনো যে এক আধটু আলাপ-সালাপের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল তার খুব ভাসা ভাসাই আমার স্মরণে আছে। তাঁর লেখনীর ভাষা আবার সম্পূর্ণ আলাদা—কিন্তু সে-ভাষাই বা আমি পাবো কোথায় ?

ডি-এল্-রায়ের হাসির গানে তোমরা ইরাণদেশের কাজির নাম শুনেচ। সেই কাজির বিচারের দু'একটা গল্প তোমাদের বল্‌ব:

একদিন সকালে কাজি সাহেব দরবারে বসেচেন এমন সময়ে এক চোর এসে তার আর্জ্জি পেশ করল—

"হুজুর ধর্ম্মাবতার, চুরি করাই হচ্ছে আমার পেশা। নিজের জাত ব্যবসা ছেড়ে দিলে পেট চল্‌বে কি করে', তাই বাধ্য হয়েই আমাকে চুরি করতে হয়। পরের সৌভাগ্য দেখলে সবারই চোখ কর্‌কর্ করে, মনে মনে হিংসা হয়—হয় না কেবল চোরের। পরের ঐশ্বর্য্যে কেবল চোরেরই চোখ টাটায় না! চোর চায় আরো সবার বাড় বাড়ন্ত হোক্!—"

কাজী সাহেব দাড়ি নাড়েন—"ঠিক ঠিক! চোরের মতন

এমন উদার মন পৃথিবীতে কার আছে! তা, তোমার আর্জিটি কি শুনি আগে।"

চোর বলতে থাকে—"হুজুর, বিষয়-কর্ম্মে কাল রাত্তিরে আমাকে বেরুতে হয়েছিল! না বেরুলে কি দিন চলে? দিন যদিই বা চলে, রাত তো আর চলে না। কি করি, দেখে শুনে, এক দর্জ্জির বাড়ী পছন্দ করলাম, ভাবলাম ওকেই আজ ফাঁক করব। এখন পরের বাড়ীতে যেতে হলে আমাকে খিরকির দিক দিয়েই ঢুকতে হয়; বাড়ীর সদর দরজা খুব কদাচই আমাদের জন্য খোলা থাকে—হুজুরের তো তা আর অজানা নেই—"

কাজি সাহেব বাধা দ্যান—"জানি জানি। আসল ঘটনা বলো!"

"দর্জ্জির বাড়ীর পেছন দিকে উঁচু দেয়াল। কাপড় শুকাতে দেবার জন্যে দেয়ালে দর্জ্জি ব্যাটা যে বদমাইসি করে' লম্বা লম্বা পেরেক পুঁতে রেখেছে তা আমার জানা ছিল না। দেয়াল টপকাতে গিয়ে সেই পেরেকে আটকে আমার কী দশা হয়েছে চেয়ে দেখুন!"

কাজি সাহেব চক্ষু বিস্ফারিত করেন। চোর কাঁদতে কাঁদতে বলে, "আমার একটা চোখ গেছে। না দর্জ্জি পেরেক পোতে, না আমার চোখ যায়! হুজুরের কাছে আমার নিবেদন, আমার চোখ ফিরিয়ে দেওয়া হোক্ আর যে-ব্যাটা দেয়ালে পেরেক মেরেছে তার সমুচিত শাস্তি হোক্। আমি সুবিচার চাই।"

চোরের কাণা-চোখটাই বেশী অশ্রুপাত করতে থাকে। কাজী সাহেব দাড়িতে হাত বুলান্ আর ভাবেন, হ্যাঁ, সুবিচার ওর প্রাপ্য বটে! দরবার থেকে দর্জ্জির তলব্ হয়।

দর্জ্জি এলে, তাকে সমস্ত জানিয়ে কাজি সাহেব তার কাছে জান্‌তে চান্ঃ "এখন কী তোমার জবাবদিহি? ওর ওই চোখের বদ্‌লি কেন তোমার একটা চোখ বাজেয়াপ্ত করা হবে না?"

শুনে তো দর্জ্জির মাথা ঘুরে যায়—তার চক্ষুস্থির!

কাজি আবার তাকে প্রশ্ন করেন, "কী তোমার কৈফিয়ৎ? বলো! বলো চট্‌পট্!"

দর্জ্জি করযোড়ে জানায়, "হুজুর, চোরের কি দরকার ছিল রাত্রে আমার বাড়ীর দেয়াল টপ্‌কাবার? যদি সে আমাকে না জানিয়ে নিজের মত্‌লবে কাজ করে তার জন্যে কি আমি দায়ী? আমার বাড়ী ও যে যাবে আগে তো ঘুণাক্ষরেও আমায় জানায় নি। যদি জানাতো—"

"তাহলে ও নিজে খোয়া গেলেও যেতো হয়তো কিন্তু চোখ ওর নিশ্চয় যেত না।" কাজি দর্জ্জির ভাবার্থটা খোলসা করে' দ্যান্।

দর্জ্জি ঘাড় নাড়ে, "হ্যাঁ, সেদিকে আমরা লক্ষ্য রাখ্‌তাম। এখন ওর যদি চোখ গিয়ে থাকে ও নিজেই সেজন্যে দায়ী। নিজের দোষে নিজের চোখ নিজেই নষ্ট করেছে।"

কাজি সাহেব কিন্তু দাড়ি নাড়েন, "কিন্তু চোর নিজের কর্ত্তব্য

করছিল মাত্র। নিজের ব্যবসার উন্নতি করার অধিকার প্রত্যে-কেরই রয়েছে। আইন কি কখনো কারো কর্ত্তব্য-কাজে বাধা ভায়?" অবশেষে দাড়ি সুবিন্যস্ত করে' তিনি দর্জ্জির প্রতি দারুণ হয়ে ওঠেন: "তুমি যদি ঐ মারাত্মক পেরেক না পুতে রাখতে তোমার দেয়ালে, তাহলে বেচারার চোখটা অমন করে' মাঠে মারা যেত না,—" বলে' নিজেকে সংশোধন করে' নেন, "মানে, বেচারার চোখটা অমন করে' দেয়ালে মারা যেত না। অতএব এজন্য তোমার একটা চোখ সরকারে বাজেয়াপ্ত হোলো।"

দর্জ্জি বেজায় কান্নাকাটি সুরু করে' ভায়, কিন্তু বৃথাই, কেননা হাকিমকে নড়ানো গেলেও হুকুম নড়ায় কার সাধ্য? এবং হুকুম যখন হয়ে গেছে তখন তামিল্ হতেও তা বাধ্য। দর্জ্জি মরীয়া হয়ে কাজীর পা জড়িয়ে ধরে,—"হুজুর ধর্ম্মাবতার, আপনি ন্যায় বিচার করেছেন তাতে সন্দেহ নেই, চোখ আমার যাওয়াই উচিত, কিন্তু ভেবে দেখুন, আমাকে কতজনের রুটি যোগাতে হয়। বৃহৎ সংসার আমার—আমার বুড়ো মা, আমার বউ এবং সাত সাতটা কাচ্চাবাচ্চা। এরা সকলেই আমার ওপরে ভরসা করে' আছে এবং আমার ভরসা আমার দুই চোখ। দর্জ্জিগিরি আমার পেশা, হুজুর জানেন! ব্যবসার উন্নতি করতে হলে দুটো চোখই কি চাইনে আমার? তার যদি একটা যায় তাহলে একটা চোখে কি করে' আমি ছুঁচে সুতো পরাব? ভালো করে' সেলাই

দর্জ্জির ওপর কাজি সাহেবের মর্জ্জি !

(পৃষ্ঠা—৬৮)

করতেই বা পারব কেন? বাজারে আমার কাজের বদ্‌নাম হবে, ফলে সপরিবারে না খেয়ে আমাদের মরতে হবে। না খেতে পেয়ে আপনার বান্দারা মারা পড়বে। ভেবে দেখুন হুজুর!"

কাজি সাহেবকে আবার দাড়িতে হাত বুলাতে হয়। হত-ভাগার কথাগুলো ভাববার মতো! ওর চোখ নেওয়াটা খুবই ন্যায্য, কিন্তু চোখ নিতে গিয়ে যদি অতগুলো আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণ নিতে হয় সেটা কি উচিত হবে? কাজিসাহেব ভয়ানক রকম ভাব্‌তে থাকেন। ব্যবসার উন্নতি করার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে, চোরের চেয়ে দর্জ্জির সে-অধিকার কিছুমাত্র কম নয়, কাজির আইনেই সেই অধিকার ন্যায়। কিন্তু চোখ গেলে বেচারার ব্যবসাই খতম্, আর—আর ব্যবসা থাক্‌লে তবেই তো ব্যবসার উন্নতি! ভাবনার কথা বটে!

চাকচিক্যময় দাড়ির দিকে তাকিয়ে দর্জ্জির প্রাণে আশার সঞ্চার হয়, তার আবেদনে কাজির দাড়ি ভিজেছে বলে' তার মনে হয় (সাধারণতঃ কাজিদের মন দাড়িতেই থাকে, এই কারণে মন ভিজ্‌লেই দাড়ি ভেজে এবং viceversa)। সে উৎসাহের সহিত বললে—"আমার এক প্রতিবেশী আছে সে শিকারী। যখন সে তাক্ করে তখন তাকে একটা চোখ বুজ্‌তে হয়। দুটো চোখ নিয়ে কী অসুবিধাই না বেচারার! কিন্তু একচোখো হলে আরেকটা চোখ বুজে থাকার কষ্ট তাকে পোহাতে হোতো না। এবং তার ফলে তার শিকার-ব্যবসা কি রকম ফলাও হয়ে উঠত

ভেবে দেখুন্ হুজুর! হুজুরের আইনেই বল্‌ছে নিজের নিজের ব্যবসার উন্নতি কর—"

কাজি সাহেব দাড়ি নাড়েন—"ঠিক ঠিক! দুনিয়ার উন্নতির জন্যই তো আইন-কানুন! কে আছিস্ ধরে' আন্ সেই ব্যাটা-শিকারীকে।"

দর্জ্জি এবার কাজির পা ছেড়ে দাঁড়ায়—"সত্যই, হুজুরের ভারী ন্যায়-বিচার!"

কাজি বলেন, "বাপু দর্জ্জি, তুমি বলেছ ঠিক। শিকারীর চোখটা একবারেই বেফাজিল, বেফয়দা, তার ব্যবসার উন্নতির বিশেষ বাধা। আর চোরের কি যায় আসে, তার একটা চোখ হলেই হোলো, তা তোমারই হোক্ আর শিকারীরই হোক্! আর আমি যখন একটা চোখ বাজেয়াপ্ত করেছি তখন সে-হুকুম আমাকে বজায় রাখতেই হবে।"

ধর্ম্মাবতারের কাছে ধরে' আন্‌বার হুকুম পেয়ে আদালতের আর্দ্দালিরা শিকারীকে বেঁধে নিয়ে আসে। তাকে কাজির হুকুম শোনানো হয়। শিকারী নানান্ বাদ-প্রতিবাদ জানায়, অনেক রকম ওজোর আপত্তি করে, ওর যে একটা চোখ বাড়্‌তি, একেবারেই অকেজো, তার কোনো দরকারেই লাগে না, বরং তার শিকারে বাধা লাগায়, কিছুতেই একথা মান্‌তে চায় না! শিকারের প্রতি ওর কি রকম লক্ষ্য খোদাই জানেন, কিন্তু ব্যবসার উন্নতির দিকে ওর যে কিছুমাত্র লক্ষ্য আছে তার কোনো লক্ষণ

দেখা যায় না। অন্ততঃ, কাজিসাহেব দেখতে পান্ না। তিনি দারুণ বিরক্ত হয়ে ওঠেন। উপকার করলে টের পায় না, দুনিয়ার অপদার্থ লোকগুলো এই রকম নিমক্‌হারাম্‌ই বটে! কাজির হুকুমে ওর একটা চোখ খুব্‌লে নিতে বিলম্ব হয় না, যদিচ কাজিসাহেবের মতে ওটা চক্ষু গ্রহণ নয়, বরং ওকে চক্ষুদানই করা হোলো বল্‌তে হবে; ওরই ব্যবসার উন্নতির দিকে দৃক্‌পাত করে' ওর বাড়তি চোখটা কমিয়ে ফেলে ওকে অধিকতর চোখা করা হোলো বইত নয়!

শিকারীর চক্ষু-দণ্ড বিধান করে' কাজিসাহেবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু কাজী ক্লান্ত হলে পাজীরা ছাড়বে কেন? যেমন করে' আখ থেকে তাড়িয়ে নিঙ্‌ড়ে রস বার করে, তেম্‌নি করে' সুবিচার আদায় করে' তবে তারা কাজীকে রেহাই দেবে। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি সবে মাত্র দাড়িতে হাত দিয়ে আরাম করছেন এমন সময়ে তিনজন ইরাণী তাঁর দরবারে এসে হাজির।

কাজীসাহেব প্রশ্ন করিলেন, "কী, তোমাদের আবার কী আর্জি? কারু কান টান্ কাটা পড়েছে নাকি এবার?"

একজন বল্‌ল, "না ধর্ম্মাবতার, কান নয়, হাঁস। আমার হাঁস কেটে হজম করে' ফেলেছে।—ঐ লোকটা!"

"হুঁ, কেউ সাক্ষী আছে?" কাজীর জিজ্ঞাস্য।

"আমিই সাক্ষী আছি, আর আমার এই বন্ধুকে ধরে' এনেছি সাক্ষী দিতে।"

'তোমার পেটের মধ্যে নিশ্চয় হাঁস গজ্‌গজ্‌ করছে !
নইলে উঁচু কেন অত ? উঁ ?'

(পৃষ্ঠা—৭৪)

কাজীসাহেব বন্ধুটিকে প্রশ্ন করেন, "তুমি দেখেছ নাকি ?"

"আলবৎ হুজুর !" বন্ধু জোরের সঙ্গে জবাব ছায়, "আমি ওই লোকটাকে চুরি করতে দেখেছি, কাটতে দেখেচি, গোটা হাঁসটাকে রেঁধে বেড়ে—কাউকে ভাগ না দিয়ে একা একাই সাবাড় করতে দেখেচি এবং এখানে দাঁড়িয়ে এখন ওকে,—ওর মোটা পেটটা একবার তাকিয়ে দেখুন্ হুজুর,—সেই হাঁসটাকে নিঃশব্দে হজম করতে দেখ্ছি।"

"বটে ?" তিনি চোরের প্রতি কটাক্ষপাত করেন, "তাহলে তোমার অপরাধের চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া গেল। তোমার পেটটা বেশ উঁচু তা দেখ্তেই পাওয়া যাচ্ছে। নিশ্চয়ই হাঁস আছে ওর মধ্যে। সন্দেহ কি ?"

হাঁস দূরে থাক্, হাঁসের একটা ডিমও যে নেই ওর পেটে, এবং ঐ সন্দেহজনক উচ্চতাটা পাকস্থলীর নয়, উল্টে ওর ভুঁড়ির, আসামী এই কথাটা হুজুরে সকাতরে নিবেদন করার নিষ্ফল একটা প্রয়াস করে, কিন্তু হাকিম ওকে থামিয়ে ছান্—"নাঃ, তুমি যে চোর সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। হাঁস চুরির জন্য দশ মোহর তোমার জরিমানা। আর দশদিন ফাটক্।"

তারপরে তিনি অভিযোগকারীকে ডাক্‌লেন—"তোমার অমনোযোগিতার জন্যেই হাঁসটা অমন বেঘোরে মারা পড়ল। হাঁস চুরি-করানোর অপরাধে তোমারও দশ মোহর জরিমানা আর দশদিন ফাটক্।"

আসামী-ফরিয়াদির সুব্যবস্থা করে' অবশেষে তিনি সাক্ষীর প্রতি ন্যায়দৃষ্টিপাত করলেন—"বাপু সাক্ষী! তুমিও লোক সুবিধের নও! নিজের কাজে মন না দিয়ে কোথায় কে কি করছে সেদিকে মন দেয়ার তোমার কি দরকার? অতএব, নিজের কাজে কামাই করার দরুণ তোমারও ঐ শাস্তি! দশমোহর জরিমানা আর দশদিন ফাটক্।"

এর পরেই দরবারে এলেন এক ধনী মহাজন। কোনো খাতক তাঁর কাছে দেড় হাজার আস্‌রফি ধারে সেই টাকাটা উদ্ধারের জন্যেই তাঁর আর্জ্জি। কর্জ্জের নিয়ম ছিল, আদালতে নালিশ রুজু করার দিন থেকে তিনবছর পরে টাকাটা মহাজনের প্রাপ্য হবে। খাতক কিন্তু তক্ষুনি টাকাটা এনে কাজিসাহেবের কাছে জমা দিয়ে ছায়।

কাজিসাহেব মামলা গ্রহণ করলেন এবং হুকুম দিলেন—"তিন বছর ফাটক্!"

মহাজন আনন্দে আত্মহারা হন্, "সত্যই হুজুরের মতো ন্যায় বিচারক দেখা যায় না, ব্যাটা আমাকে ভয়ানক ভুগিয়েছে, তিন বছর ফাটক্ ওর উপযুক্ত শাস্তিই বটে! এখন আস্‌রফিগুলো অধীনকে দিতে হুকুম হয় হুজুরের।"

"উঁহু।" কাজিসাহেব দাড়ি নাড়েন: "সে-তো তিন বছর পরে। যেমন লেখাপড়া আছে তেমনি তো হবে। ও-টাকা আমার জিম্মায় থাক্‌ল। এখন তুমি গিয়ে ফাটকে থাকো গে!"

মহাজন আকাশ থেকে পড়েন, "য়্যাঁ? ফাটকে আমি! আমার ফাটক্ কেন?"

"বাপু! তোমারই তো ফাটক হবে! এখন থেকে তিন বছর পরে তুমি কোথায় থাক্‌বে আমি জান্‌ব কি করে'? তখন তোমাকে পাবই বা কোথায়? সেইজন্য তোমাকে আটক রাখা হোলো. আস্‌রফিগুলো তোমাকেই তো দিতে হবে, অপর কাউকে দিলে তো চলবে না। কম টাকা নয়, তিন তিন হাজার আস্‌রফি! তিন বছর পরে যদি তোমাকে না পাওয়া যায়, তোমার টাকা নিতে যদি তুমি না আসো—তখন কোথায় তোমাকে আমি হরের মা হরের মা করে' খুজে বেড়াব বলো?"

এতখানি ন্যায়-বিচারের পরিশ্রমে কাজিসাহেব নাস্তানাবুদ হয়ে পড়েন। তিনি দরবার পরিত্যাগের জন্য প্রস্তুত হন্। পেস্কারকে বলেন—"নাঃ বাপু, আর পারা যায় না! সুবিচার করতে করতে প্রাণটা গেল। আইন বজায় রাখা কি সহজ কাজ? বড্ড খাটুনি হয়েছে. আজ আর না, কি বল?"

পেস্কার সেলাম ঠুকে জবাব দ্যায়: "জনাবের যেমন মর্‌জি!"

"হ্যাঁ, আজ আর না! দাড়ি ঘেমে গেছে। যারা সুবিচারের প্রত্যাশায় এসেছে তাদের কাল আস্‌তে বলে' দাও।" এই বলে' তিনি দাড়ি চুম্‌রাতে চুম্‌রাতে চলে যান্।*

---

* এই গল্পটি ইংরেজিতে অনূদিত ইরাণদেশীয় একটি উপকথা থেকে নেওয়া।

বাড়ীটা নিয়ে ভারী মুস্কিলেই পড়া গেছে। কী যে করি ভেবে কূল পাচ্ছি না। নিবারণ আমায় বুঝিয়েছিল এত বড়ো বাড়ী সবটা একা জোড়া করে' নাম-মাত্র-আমার জড়ো হয়ে থাকাটা বড্ডই বাড়াবাড়ি—এতগুলো ঘর বেঘোরে না যেতে দিয়ে, এই ভাবে বরবাদ না করে', ভাড়া দিলে তো পয়সা আসে! আর আমার থাকা! আমি তো অনায়াসেই দুখানা ঘরওয়ালা একটা ফ্ল্যাট্ ভাড়া করে' থাক্‌তে পারি। তাতে কতখানি সাশ্রয়!

নিবারণের পরামর্শে বাড়ীটাকে আজাড় করে' তার গায়ে 'টুলেট্' লট্‌কে দিয়ে, একটা ফ্ল্যাটে এসে আমি আশ্রয় নিয়েছি। কিন্তু ওই পর্য্যন্তই! এদিকে মাসকে মাস আমাকে ফ্ল্যাটের ভাড়া গুণ্‌তে হচ্ছে, নগদ্ থোক্ থোক্—আর ওদিকে টুলেট্

লট্‌কানোই সার! ভাড়াটের সাক্ষাৎ নেই! আর ভাড়াটে যদি বা আসে, ভাড়া আসে না। দয়াপরবশ হয়ে কোনো ভাড়াটে অযাচিতই যদি বা আসেন, এসে পড়েন, ভাড়ার জন্য একটু পীড়াপীড়ি কর্‌তে না কর্‌তেই, অজ্ঞাতসারেই তেম্‌নি চলে' যান্! বল্‌তে গেলে, ওইটুকুই যা কৃপা করে' যান্।

আবার নিবারণের পরামর্শ নিতে হয়।

"পাবে পাবে, পাবে বইকি! ভাড়াটে আর পাবে না? অতো তাড়া কিসের? বাড়ী কিছু আর খালি পড়ে থাক্‌বে না চিরদিন।" নিবারণ আমাকে উৎসাহ ছায়।

"হ্যাঁ, চাম্‌চিকেরা এসে জুটবে, খালি থাক্‌বে না, তা জানি। কিন্তু তাতে আর কি?" আমি বলি: "তাতে তো আর পয়সা আস্‌বে না।" আমি বল্‌তে চাই।

"তাহলে এক কাজ করো না! বেচে দাও না কেন? কি বলো?"

"বাঃ, বেশ বল্‌চ তো! নিজের একখানা বাড়ী, বেওয়ারিশ্ সূত্রে পাওয়া, তাও খুইয়ে, সারা জন্ম পরের বাড়ীতে মাথা গুঁজে টাকা গুণ্‌ব! মন্দ না!"

"এমন কি মন্দ? মব্‌লগ্ কিছু টাকা মেরে নিতে পারবে এই ফাঁকে? আর তাছাড়া, নিজের ভাড়া গোণার কথা বল্‌চ? বাড়ী-বেচা টাকাটা ব্যাঙ্কে রেখে দিলেই তো হয়! তারই সুদে কি আর ফ্ল্যাটের ভাড়া ওঠে না? কী যে বলো!"

কথাটা ভেবে দেখবার মতো। খালি বাড়ী থেকে কিছু আসে না, কিছুই আসে না, কিন্তু বাড়ীটাকে টাকা বানিয়ে সুদে বাড়াতে পার্‌লে—মাস মাস আর ফ্ল্যাটের ভাড়াটা গুণ্‌তে হয় না বটে! হয়ত কিছু বাড়তিও আসে—যদি তেমন তেমন ব্যাঙ্কে রাখা যায়। তবে কিনা, সে সব ব্যাঙ্ক প্রায় রিভার্‌-ব্যাঙ্কের সমগোত্র, তাই বড়ো ভরসা হয় না।

যাক্‌, বাড়তিতে আমার কাজ কি? নিবারণকে বলি: "সেই ভালো! তাহলে একটা খদ্দের ছাখো, কিন্তু এই যুদ্ধের বাজারে কেউ কিন্‌বে কি?"

"ধরে বেঁধে কেনাতে হবে—গছাতেই হবে কাউকে। এখন কি কেউ আর বাড়ী কেনে? সবাই বেচবার তালে রয়েছে! শতশত সহস্র-সহস্র বোমা পড়বে, ইস্তাহারজারি করে' দিয়েছে যে! ঘরবাড়ী একখানাও থাক্‌বে কি? একখানা ইঁট আস্ত থাক্‌লে হয়! কিছু কি টি"কবে আর সেই ধাক্কায়—তাই ত বল্‌ছিলাম হে! এই ফাঁকে বাড়ীটাকে আসল জিনিষে বাড়িয়ে নাও—যাকে বলে ক্যাশ টাকা!"

কথাটা নিবারণ নেহাৎ মন্দ ব'লেনি। ভাব্‌বার কথাই। কথা ও মন্দ বলে না—এবং ভাববার কথাই বলে। আমি চিরদিন ধরে' দেখে আসছি, ওর কথা শুন্‌লেই আমি খুব ভাবিত হয়ে পড়ি।

বন্ধুদের জন্যে ও ভাবে। এ বিষয়ে ওর চিন্তাশীলতা সর্ব্ব-

জনবিদিত। অবশ্যি, বন্ধুদের ভালোর কথাই ভাবে। এ রকম বন্ধু-বৎসল স্বভাবতঃ দেখা যায় না! আর, বল্‌তে কি, বন্ধুদেরও ও খুব কম ভাবায় না!

বন্ধু-বৎসল এবং সেই সঙ্গে কি রকম পরোপকারী! পরের উপকার করার কোনো ফাঁক পেয়েছে কি আর রক্ষে নেই, অম্‌নি ছুটে গিয়ে তার উপকার করে' বসে' আছে। উপকার ও করবেই, বদ্ধপরিকর, বন্ধুঅন্তপ্রাণ পরার্থপর নিবারণকে ওখন নিবারণ করে, কার সাধ্য?

একবার কে একজন ওকে মেয়ের পাত্র খুঁজে দিতে বলেছিল। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ, সারা ভূ-ভারত খুঁজে, কোথাও মেয়ের বর না পেয়ে, পরহিতকর নিবারণ কি আর করে? ক্ষতিপূরণ হিসেবে, নিজেকেই সমর্পণ করে' বস্‌ল। নিজেই মেয়েটাকে বিয়ে করে' ফেল্‌লে। বা, ফেস্‌তে চাইলে। এবং তাও নিজের ক্ষতিপূরণ বাবদে নয়—নিজের অতো হাঁটাহাঁটির, কি, মাথা ঘামানোর খেসারৎ হিসেবে না—ভাবো দিকি একবার! এ হেন নিস্বার্থপর আমাদের নিবারণ!

কি ভাগ্যি, মেয়েটা, বিবাহিত হবার ভয়েই কিনা কে জানে, বিয়ের আগেই, অসুখের ছুতো করে' মারা পড়ে গেল। নিবারণের উপকারিতার আর পরিচয় পেল না। কিন্তু, যাই বলো, বন্ধু বল্‌তে হয় তো আমাদের নিবারণকে!

আমিও এ-জাতীয় নিবারণের ওপর নিজের উপকারের ভার

দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যাই :—"তাই ছাখো ভাই ! ছাখো যদি একটা ভালো খদ্দের টদ্দের পাও। দাঁওয়ের মাথায় যদি বেচতে পারো বাড়ীটাকে ! বোমার ধাক্কায় বেমালুম্ হবার আগেই, বাড়ীখানাকে যদি কাউকে ধরে বেঁধে গছিয়ে দিতে পারো !" বলে' আসি বিশেষ করে'।

বলে' এসে নিজের ফ্ল্যাটে ভালো করে' না পৌঁছতেই, টেলিফোনে কিড়িং কিড়িং বেজে ওঠে। আমিও তিড়িং বিড়িং করে' ছুটে যাই।

"হ্যাঁ, ভালো কথা !—" ফোনের ওধারে আমাদের নিবারণের গলা : "দামটা কতো চাও বলে' যাওনি তো !"

কি রকম তৎপর আমাদের নিবারণ ছাখো—সত্যি ! এর মধ্যে কতখানি ভেবে ফেলেছে—আর কতোদূর এগিয়ে গেছে। ও যদি, ওরকম বন্ধু যদি এতখানি উঠে পড়ে লাগে তাহলে বাড়ীটার একটা গতি না করে' ছাড়বে না—সহজে ছাড়বে না। এবং বলা বাহুল্য, বাড়ীটার সদ্‌গতিই হবে—এতটাই যদি ও ক্ষেপে গিয়ে থাকে, তাহলে তাড়াতাড়ি একটা মক্কেল জুটে যেতে আর কতক্ষণ ?

"কতো চাওয়া যায় ? হাজার বারো ?" আমি বলি : "ওরকম বাড়ী বারো হাজারের কমে কি দেওয়া যায় ? তৈরি করতেই তো পনের হাজার পড়েছিল বলে' শুনেছি।"

"উঁহু। দশ হাজার পাঁচ শো। সাড়ে দশ হাজার, এক কথায়।"

"তাই বেশ।" এক কথায় রাজি হয়ে যাই। একটু কমিয়ে সমিয়ে না দিলে আজকের বাজারে—এই ভয়াবহ বাজারে—ভীতিপ্রদ দুঃসময়ে—কে কিনবে?

"আচ্ছা, ন হাজার নশো পঁয়তাল্লিশ করলে কেমন হয়?" ফোনের ওধার থেকে নিবারণ ফের গলা বাড়িয়ে ছায়ঃ "এই ধরো না কেন, বাটার জুতো যেমন! চার টাকার জুতোটা তিন টাকা পনের আনা, ছাখোনি? এক আনার ফারাক্, অথচ লোকে ভাবে কতই না জানি সস্তা দিয়েছে! আর অম্‌নি ঝরাঝ্‌ঝর্ বিক্রি!"

"বেশ তাই করো তাহলে! যখন তুমি ভালো বুঝেচ—" মুহূর্তের মধ্যে বাড়ীটাকে বাটার জুতোর সমপর্য্যায়ে এনে ফেলি। ছু পাঁচ দশ বিশ ছুশো একশোয় কিছু আসে যায় না, বিক্রি করা নিয়ে কথা। দূরদর্শী নিবারণ আমাকে বিশদ করে' বুঝিয়ে ছায়—পরের-কল্যাণ-কাতর বিচক্ষণ আমাদের নিবারণ! আমারও বুঝতে খুব দেরি হয় না।

আশায় আশায় কদিন কেটে যায়। এবার বাড়ীখানার একটা গতি হবেই। নিবারণ যখন হাত দিয়েছে—

কিন্তু নিবারণের আর কোনো সাড়া নেই। দেখা সাক্ষাৎও নেই আর। আমার আশাও প্রায় ছাড়-ছাড়, এমন সময়ে একদিন নিবারণ আমার ফ্ল্যাটে এসে হাজির।

"পাড়াগেঁয়ে এক জমিদারকে বাগিয়ে এনেছি ভাই! এক্ষুণি,

টেলিফোন কিড়িং কিড়িং করে' ওঠে !

(পৃষ্ঠা— ৮১)

তাকে বাড়ীটা দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি। তোমাকে একটা কথা বলতে এলুম।"

"কি কথা?" আমার আশা আবার তখন, উসকে উঠেছে।

"জমিদার ভদ্রলোক কিন্তু নহাজার নশো পঁয়তাল্লিশ শুনতেই রাজি নন্। বলছেন, অতগুলো সংখ্যা কখনো মনে রাখা যায়! তিনি বলছেন, এক কথায় মিটিয়ে ফেলুন—পুরোপুরি ন হাজার! তুমি কি বলো?"—নিবারণ বল্ল।

আমি কি বলব? ষোলো হাজার টাকার বাড়ীটা—ন হাজারে? বলবার ঠিক ভাষা খুঁজে পাই না। মুখের মত জবাবের জন্যে মনের মধ্যে হাতড়াই।

"তবে যে তুমি বল্লে, বাটার জুতো? বাটার জুতোর মতো করলেই টক্ করে' লোকে গিলে ফেলবে?" এই কথাই বলি। ওর কথাই ওকে মনে করিয়ে দিই।

"গিলেওছে তো, কেবল ঐ অতগুলো শব্দ—বনেদী জমিদার কিনা! উচ্চারণ করতেই কষ্ট হচ্ছে। ন হাজার নশো পঁয়তাল্লিশ—কমখানি কথা নয় তো!"

"দশ হাজার করলে হয় না? এক কথায় ফুরিয়ে যায়। তাহলে—তাহলেও তো হয়?" আমার মনের কথাটা, বেশী খোঁজা-খুঁজি না করতেই এবার চট্ করে' মুখের গোড়ায় চলে আসে।

"উঁহু, ন হাজারই ভালো। বাটার জুতোই প্রায় বলতে গেলে—নেহাৎ কম কি?" নিবারণ আমাকে সমঝায়।

"আচ্ছা ভাই—তাই থাক্ তবে।" ঢোঁক্ গিলে রাজি হই।

"চল্লুম্ বাড়ী দেখাতে। কদ্দূর এগুলো ফোন্ করে' জানাব।" এই বলে' নিবারণ বেরিয়ে গেল।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং! টেবিলের ওপর টেলিফোনটা আর্ত্তনাদ করে' উঠেছে!

শশব্যস্ত হয়ে ফোণে কান দিই। "হ্যালো! নিবারণ? হ্যাঁ—কদ্দূর—?" চট্‌পট্ কর্ণপাত করি। ঔৎসুক্যে, আগ্রহে, থর থর করে' কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে—

"এই এগুচ্ছে! ভদ্রলোক এখনো চারধার ঘুরে' ফিরে দেখ্‌ছেন। হ্যাঁ, ভালো কথা! তোমার এক তলার মেঝে ড্যাম্পো, তা জানো?"

"দেখ্‌লে বোঝা যায় না।" আমি জবাব দিইঃ "লক্ষ্য করবার মতো নয়।"

"ভদ্রলোক কিন্তু লক্ষ্য করেছেন।" নিবারণ বলেঃ "মেঝে শুঁকেই বলে' দিয়েছেন তিনি। নিজেই হামাগুড়ি দিয়ে শুঁকে দেখ্‌লেন!"

ও বাবা! মেঝে শুঁকে যে ড্যাম্পো বার করে—এতখানি যার ঘ্রাণশক্তি—সে কি আর ওবাড়ী কিন্‌বে? সহজে কিন্‌বে বলে তো মনে হয় না!

হৃদয়ে খুব আঘাত লাগে। আহত হয়ে হতাশ হয়ে পড়ি।

"তাহলে কি বলো? আশা নেই?"

"না, না—আশা আছে বইকি! তবে দর আরো কমাতে হবে, এই যা!" নিবারণের জবাব আসে।

"ছাখো যতটা না কমিয়ে পারো—যতটা বেশীর মধ্যে পারা যায়।" আমি বলি। কি আর বলব? "যথাসাধ্য চেষ্টা করে' ছাখো—যদ্দূর হয়!"

"আমি এক্ষুণি তোমাকে ফলাফল জানাচ্ছি। টেলিফোনে কান দিয়ে থাকো। আর—মনে মনে ভগবানকে ডাকো! ভদ্রলোক কেন খুঁজ্‌ছেন আমায়, শুনে আসি।"

টেলিফোনে কান খাড়া করে' থাকি—নিবারণের খবরের প্রত্যাশায়। ভগবানের প্রত্যাদেশের ভরসায়।

একটু বাদেই নিবারণের গলা পাই।

"তোমার রান্নাঘরের দেয়ালে কী কালি! মাগো! ভদ্রলোক একবার দেয়ালে হাত বুলিয়েই, হাতখানা আমার মুখের ওপরে তুলে ধরেছেন।"

"সেই হাত দিয়ে ওঁর নিজের গালে এক চড় কসিয়ে দিতে পারলে না?" আমি কঠোর কণ্ঠে অভিভাষণ দিই।

সত্যি, আমার ভারী রাগ হয়ে যায়! রান্নাঘরের দেয়ালে কালি ঝুল থাকবে না তো কি অবনী ঠাকুরের ছবি ঝুলবে নাকি! অ্যাঁ? এমন খুঁৎখুঁতে লোকের আবার বাড়ী কেনার সখ্ কেন?

"তাছাড়া, তোমার বাথ্‌রুমের কোণে একটা গর্ত্ত রয়েছে—"

"আছাড় খেলেন আর পাঁচশো টাকা কমে গেল—কি করব?"

।—৯৫)

নিবারণ বলে যায়: "গর্ত্তটা চোখে পড়েছে ওঁর। বলতে কি, উপু হয়ে বসে ঐ গর্ত্তটাই এখন উনি পর্য্যবেক্ষণ কর্‌ছেন! ওর ভেতর দিয়ে ইঁদুর যাতায়াত করে কিনা, জানতে চাইছেন উনি।"

"আমি কি বেড়াল নাকি যে ইঁদুরের খবর রাখব? আমি জান্‌ব কি করে'?" রেগে মেগে আমি রিসিভার রেখে দিই। আমার বাড়ী বিক্রি করে' কাজ নেই। বাড়ীকে অপমান করা মানে আমাকেই অপমান করা! এত বাড়াবাড়ি অসহ্য! এমন বখাটে বাজে লোককে বাড়ী বেচিতো আমার নাম—!

সাথে সাথেই আবার ক্রিং ক্রিং! প্রতিজ্ঞা ভুলে, রিসিভার তুল্‌তে হয়।

"সাড়ে আট হাজারে তুমি কি রাজি?" নিবারণ জান্‌তে চায়।

"না, না, কিছুতেই না।" এক কথায় জানিয়ে দিই।

"শোবার-ঘরের দেয়ালের ফাটল্‌টা উনি দেখ্‌তে পেয়েছেন—" নিবারণ তবু আবার গলা বাড়ায়।

"তাহলে খাবারঘরের দেয়ালেরটাও ওঁকে দেখিয়ে দাও।" আওয়াজ্‌ কড়া করে' জানিয়ে দিই. "সে ফাটল্‌টা আরো বড়ো। বৃহৎ আরো! তার ভেতর দিয়ে রান্নাঘরের সব কিছু দেখা যায়। সোজাসুজিই চোখে পড়ে।"

"দেখাবার দরকার করবে না, নিজেই দেখ্‌তে পাবেন। ভদ্রলোক যে রকম অনুসন্ধিৎসু! সমস্ত খুটিনাটির দিকে যেরকম ওঁর খর দৃষ্টি! এই মুহূর্ত্তেই উনি তোমার বৈঠকখানাটা পরীক্ষা

করছেন! টেবিলের ওপর বেঞ্চি খাড়া করে' তার ওপর চেয়ার চাপিয়ে, তার ওপরে দাঁড়িয়ে, নিজেই সশরীরে দণ্ডায়মান হয়ে—ছাতির বাঁট্ দিয়ে ঠুকে ঠুকে তোমার কড়িকাঠ সিলিং ইত্যাদি সব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাজিয়ে দেখ্‌ছেন! ফাঁকা কিনা, ফাঁপা কিনা, ধোপে টিকসই কিনা দেখ্‌ছেন বাজিয়ে!"

কেবল নীচু নজরই না, ভদ্রলোকের উঁচু নজরও বেশ রয়েছে! কিন্তু শোন্‌বামাত্রই আমার মেজাজ্ আরো বিগ্‌ড়ে যায়।

"ছাখো, নিবারণ—" আমি জোরালো গলাকে যদ্দূর সম্ভব ঘোরালো করে' আনি: "তোমার মক্কেলকে ভালো করে' সমঝে দাও, যদি আমার সিলিংএর কিছুমাত্র ড্যামেজ্ হয়, তাঁর ছাতির খোঁচায় ছাতের কোনো হানি ঘটে, তাহলে ওঁকে তার দস্তুরমতো খেসারৎ দিতে হবে, বলে' দাও যে এটা মানুষের বসত বাড়ী—পায়রার খোপ্ নয়, পাখীর খাঁচাও না, যে ঠুকে-ঠাকে পরীক্ষা করে' দেখ্‌বেন!"

'বল্‌ব বইকি! অবশ্যই বল্‌ব! কিন্তু ভাই, বাড়ীটার দাম আট হাজারও উঠবে কিনা কে জানে, কেন না কাঁচা গাঁথ্‌নি বলেই সন্দেহ হচ্ছে কি না!"

"কাঁচা গাঁথ্‌নিই হোক আর ডিনামাইটের তৈরিই হোক্—সাড়ে আট হাজারের এক পয়সা কমে নয়।" আমার সাফ জবাব। "ওর এক পাই কমে আমি নারাজ।"

"তাছাড়া বাড়ীটার আরেক দোষ। তোমার দক্ষিণ দিক

খোলা নয়। ডান দিকের বাড়ীগুলো আরো বেশী উঁচু উঁচু, সেটা দেখেছ?"

"তাও কি আমার বাড়ীর দোষ? অন্য লোকের বাড়ী উঁচু হবে—আমি তার কি করব?"

"তাছাড়া, তোমার ইলেক্‌ট্রিক্ কনেক্‌শন্ কেটে দিয়ে, মীটার্ নিয়ে চলে গেছে। ইলেক্‌টিক্ বিল্ শোধ করোনি বুঝি? আবার নতুন করে' কনেক্‌শন্ করাতে হবে। সে এক হাঙ্গামা! সাত হাজারে কিন্‌তে রাজি হলে বাঁচি!"

"ছাখো, আমার শেষ কথা! সাড়ে সাত হাজার পর্য্যন্ত আমি আছি কিন্তু তার নীচে আমি নেই, সাত হাজারের আধ পয়সা কম নয়। এই আমার শেষ কথা।"

"দেখি, যদ্দুর পারি। চেষ্টার ত্রুটি তো করছিনে!" নিবারণ প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল।

এবং আধঘণ্টা ধরে' ওর যৎপরোনাস্তি ও করল—যতটা ওর সাধ্য, যতখানি ওর কর্‌বার্, যদ্দর পর্য্যন্ত ওর ক্ষমতার মধ্যে, তার বাকী কিছু রাখল না।

আধঘণ্টা পরে, ফের আবার ওর টের পেলাম।

"কী সর্ব্বনাশ! তোমার দেয়ালের চূণ বালি সব খসে পড়ছে যে! তোমার বাড়ীর অবস্থা যে এতো কাহিল একথা তো আগে আমায় বলো নি? ভদ্রলোক বারান্দার গায়ে হাত দিতে না দিতেই এতো বড়ো এক চাপ্‌ড়া তাঁর হাতে নেমে এসেছে! তিনি

সেটাকে ধরে'—দুহাতে ধরে', ধরাধরি করে,' ছুঁয়ে নামিয়ে রেখেছেন। এই মাত্রই রাখ্‌লেন।"

"তুমি এক কাজ করো। ওই চাপ্‌ড়াটা তুলে, দুহাতেই তুলে—ভদ্রলোকের মুখের ওপর ছুঁড়ে মারো।"

"বাড়ীটা প্রায় বেচে ফেলেছিলাম ভাই! সাত হাজারেই রাজি হয়ে গেছল—কিন্তু ওই চাপ্‌ড়াটাই মাটি করল।"

"কসে' একটা চাপড় বসিয়ে দিলে কি ওর চেয়েও আর-কিছু বেশী মাটি হবে?" আমি জিজ্ঞেস করি। না হয় তাই গিয়ে, আমি নিজেই গিয়ে, মাটি করি।

"এখন আর সাত হাজার শুন্‌তে উনি রাজি নন্‌!" নিবারণ আমার পরামর্শ চায়: "কি বলি তাহলে ওঁকে? সাড়ে ছ' বল্‌বো? কিন্তু ছ'তেও রাজি হবেন কি না সন্দেহ! ছ'ই বলি, কেমন?"

"ছ্যাখো, তুমি অমন করে' আমাকে প্রলুব্ধ কোরো না, বল্‌চি।" নিবারণকে আমি সাবধান করে দি: "হয়তো ওই দামেই আমি দিয়ে বসতে পারি।"

"ভদ্রলোক তোমার একতলার ঘরগুলোর মেজের এখন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন! মেঝে শক্ত কিনা, পোক্ত কিনা, লাফ্‌ঝাঁপ্‌ মেরে কসে-মেজে নিরিখ করে' দেখচেন। একতলা সেরে, তারপর দোতলা তেতলায় পরীক্ষা করতে যাবেন।"

"ভদ্রলোক খুব মোটা কি?" আমার সন্ত্রস্ত প্রশ্ন।

"বেজায়! পাড়াগাঁর জমিদার মানুষ, বুঝ্তেই পারছ! রুইমাছমাংসে বনেদী একখান্ চেহারা বাগিয়েছেন বটে! পাকা তিন মণের কম যান্ না।"

"পাকা তিন মণ! য়্যা, ঐ বপু নিয়ে তিনি দোতলা তেতলার মেজে পরীক্ষা করতে যাবেন? মেজের ওপর স্কিপ্ করবেন—তুমি বলো কি? বারণ করো, বারণ করো ভদ্রলোককে।"

"বারণ করলে শুনছেন না।" নিবারণ জানায়ঃ "বাড়ী কিনতে এসেছেন, দেখেশুনে ভালো করে' না বাজিয়েই কি বাড়ী কেনা যায়, বলছেন উনি।"

"তুমি পাঁচহাজারে রাজি হয়ে যাও। এই মুহূর্তে বেচে দাও এক্ষুণি। বেচে দিয়ে তারপর অন্য কথা! দোতলায় তেতলায় গিয়ে স্কিপ্ করবার আগেই বেচে ফ্যালো—কেনবার পরে, তাঁর নিজের বাড়ীর মেজেয় দাঁড়িয়ে যত খুসি উনি লম্ফঝম্প করুন, আমার যায় আসে না। ওঁর নটরাজ নৃত্যেও আমার কোনো আপত্তি নেই! বাপ্স্! পাকা তিনমণ যদি তেতলায় গিয়ে লাফ্ মারে—ডিগ্বাজি খায় তাহলে আমার বাড়ীতো তার চাপেই তক্ষুণি ভেঙে পড়বে, বিক্রী করবার কিছু বাকী থাক্বেনা, দেখতে শুনতে হবে না আর।"

"পাঁচ হাজার? বলছ কি? তাহলে তো লুফে নেবে এক্ষুণি—যতই না কেন বাড়ীটার খুঁৎ থাক্! জলের দর হয়ে গেল যে!" এই বলে' নিবারণ তর্ তর্ বেগে চলে যায়।

'আচ্ছা, গুড্ বাই, মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, পরে আবার দেখা হবে!'

(পৃষ্ঠা—৯৮)

আবার আধঘণ্টা পরে টেলিফোন্ আসে। "কী, লুফে নিয়েছে তো ? পাঁচ হাজারেই নিয়েছে তো ?" আমিই আগে গলা জাহির করি।

"উঁহু। তুমি ছাদের কথা আমায় জানাওনি তো !" নিবারণ জানায় : "ছাদ দিয়ে তোমার জল পড়ে।"

"বর্ষাকালেই কেবল !" আমাকে প্রতিবাদ করতে হয় : "সব সময়ে পড়ে না।"

"ভদ্রলোক এক ঘড়া জল ঢেলে এইমাত্র পরীক্ষা করে' দেখলেন। ফাটা ছাদ—কী আর করা যায় ? সাড়ে চার হাজারে পাকাপাকি রফা হয়েছে !"

"সাড়ে—চার—হাজার !—" আমি ভগ্নকণ্ঠে বলি : "সাড়ে চার হাজার মোটে ! বারো হাজার থেকে সাড়ে চার—বলো কি !"

"ছাখো, আমি ভালো কথাই বল্‌ছি। সাড়ে চারেই রাজি হয়ে যাও। এর বেশী আজকালকার বাজারে পাবেনা কোথাও। এমন কি, চার হাজার হলেও একটা দাঁও বল্‌তে হবে—তাতেও তুমি লাভবান্। কেননা, এ যা বাড়ী, যদি ছুমাইলের মধ্যেও একটা বোমা পড়ে, তার ধাক্কাতেই তক্ষুণি ভূমিসাৎ ! সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। এর হাড় পাঁজ্‌রায় কিচ্ছু নেই !—আমি হলে তো পাঁচ শো দিতেও রাজি হতুম না।"

আমি সাড়ে চারেই রাজি হয়ে যাই। অগত্যা।

আধ ঘণ্টা বাদে নিবারণ একটা চার হাজারের চেক্ এনে

'বলো কি !—' বল্‌তে গেলাম, কিন্তু গলা দিয়ে বেরুল না। আমার পরিত্যক্ত বাড়ী যে এইভাবে একজন অপরিচিত ভদ্রলোককে উত্যক্ত করছে, তাঁর অনূঢ়া কন্যার বিবাহে প্রতিবেশীর মতো ভাঙ্‌চি দিচ্ছে, ভাব্‌তেই আমার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল।

"আমি ভদ্রলোককে বল্লাম, মাপ করবেন মশাই,—" নিবারণ বল্‌তে থাকে: "এ বাড়ী ফের বিক্রি করা সে আমার কর্ম্ম না। একবার বিক্রি কর্‌তেই, মানে, আপনাকে দিয়ে কেনাতেই আমার প্রাণ বেরিয়ে গেছে, তারপর আবার? বাপ্‌রে! তার চেয়ে বলুন্, যদি এ-বাড়ী মেয়ের বিয়েয় বাগ্‌ড়া লাগায়, আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি আছি বরং!"

"বলো কি!" এবার কথাটা কষ্টে স্বষ্টে উচ্চারণ করতে পারলাম। কিন্তু সত্যি বল্‌তে কি, এ বিষয়ে আমার বিস্ময়ের বিশেষ কিছু ছিল না। নিবারণ যে অপরকে দায় থেকে উদ্ধার করতে নিজেকে বিদায় দিতে কার্পণ্য করবে না, এ আর বেশী কি? ও চিরদিনই এম্‌নি শিভাল্‌রাস্, আমার জানা কথা। ওর মতো পরোপকারী জীব, পৃথিবীতে কই আর?

"ভদ্রলোক তাতেই রাজি হলেন। কী করবেন? এই বাড়ী ঘাড়ে করে' তো আর বাড়ী বাড়ী ঘোরা যায় না?" নিবারণ বল্ল।

"তা বটে!" আমি সায় দিই: "তার ওপর বোঝার পরে শাকের আঁটি—সেই মেয়েটি—"

"সেত রয়েছেই! কিন্তু ভাই বল্‌তে কি, যখনই তুমি বাড়ী বেচ্‌তে ক্ষেপে উঠেছিলে, আর এই ভদ্রলোক, তাঁর মেয়ে জামাইয়ের জন্যে একটা বাড়ী কিনে দিতে আমাকে চেপে ধরেছিলেন, তখনই আমি জানি, তখনই টের পেয়েছি যে ভদ্রলোকের এই মেয়ে—আর তোমার এই বাড়ী—মানে ভদ্রলোকের এই বাড়ী—আর তোমার এই মেয়ে—মানে কি যে এই বাড়ী আর এই মেয়ে—আমার কপালেই নাচ্‌ছে!"

"আর তাই বুঝি তুমি অত করে'—অত উঠে পড়ে লেগে—আমার এমন বাড়ীটা জলের দামে তোমার শ্বশুরকে বেচে দিলে?" অকস্মাৎ আমার চোখ খুলে যায়ঃ "তুমি এই বাড়ীর—মানে আমাদের বাড়ীর জামাই হবে বলে'?" মুখও খোলে আমার।

"তা—তা—তা তুমি বল্‌তে পারো বটে।" নিরারণ তো তো করতে থাকেঃ "নিজের বাড়ীর দোষ তো কেউ ছাখে না! পরের ভালোটাই সবার নজর পড়ে। কিন্তু আমার একটু দূরদৃষ্টি আছে—ভগবান আমাকে একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে রেখেছেন—তাঁর দয়া!—সে কি আমার অপরাধ?"

বাড়ীর দরজা খুলে, একটি মেয়ে, আমাদের কথোপকথনের মাঝখানে বেরিয়ে আসে।

নিবারণের সদ্য-বিবাহিতা, দেখ্‌বামাত্রই বুঝ্‌লাম।

"আচ্ছা গুড্‌বাই, দেখা হবে আবার। আজ ভারী তাড়া!

আমরা একটু মার্কেটিংয়ে বেরুচ্ছিলাম। কিছু মনে কোরো না। আরেকদিন গল্প সল্প হবে এখন।" নিবারণ হাত বাড়িয়ে আমার করমর্দ্দন করল—কথা-কাটাকাটি এবং—কথা-কাটাকাটি থেকে অবশ্যম্ভাবী হাতাহাতি—ওই সামান্যর ওপর দিয়েই সেরে নিতে চাইল সে।

"আচ্ছা, আরেকদিন হবে'খন!" আমিও দাঁত কিড়মিড় করলুম।

কিন্তু আরেকদিন আর কী হবে? কী আর হতে পারে? আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ভাবি। যার দূরদৃষ্টি নেই, ভগবানের দয়ায় নেই, যার ওপর ভগবানের এতটাই অকৃপা, তার আর কী আছে? একেবারে কিছুই নেই, হয়ত নয়; হয়ত কিছু আছে। দুরদৃষ্টই রয়েছে তার। সেই দুরদৃষ্টই আমার অদূর দৃষ্টির সামনে আস্তে আস্তে ভাস্তে থাকে।

খতম!

READING LIBRARY